নুরজাহান

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কলিকাতা

"মানসী প্রেস," ১৪ এ রামতনু বসুর লেন হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য দুই টাকা

সূচী

চিত্র-সূচী

[illegible]
যিনি চরিত্রহীন অপেক্ষাও
মহীয়সী-তাঁহারই-হাতে-
চরিত্রহীন সাদরে-সমর্পিত-হইল।

১লা আশ্বিন, ১৩২৪



সম জ্ঞী নূরজাহান বেগম

নূরজাহান

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম-বিড়ম্বনা

বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বীরাগ্রগণ্য বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে কান্দাহার হইতে যে পথে ভারতবর্ষে আসিতে হইত, সে পথ বড় সুগম ছিল না। নতোন্নত পার্ব্বত্যভূমির উপর দিয়া সেই বৃক্ষবিহীন বক্র-বিসর্পিত ক্ষুদ্র পথে গমনাগমন করিতে অতি বড় সাহসী বীর-পুরুষেরও হৃদয় কম্পিত হইত ; নিতান্ত বাধ্য না হইলে, কেহই সে পথে একাকী যাত্রা করিতে সাহস করিত না। কার্য্যানুরোধে কাহাকেও সে পথে যাইতে হইলে, দস্যু-তস্করের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপযোগী জনবল সঙ্গে লইয়া, প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করতঃ সুবন্দোবস্ত করিয়া যাত্রা করিতে হইত ; এবং এত

করিয়াও সকল সময়ে সকলে সর্ব্বথা নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য-স্থানে পহুঁছিতে পারিত না। এরূপ ভয়সঙ্কুল বিঘ্নবহুল পথে যাহাকে পথশ্রমে অনভ্যস্তা অসূর্য্যম্পশ্যা গর্ভভার-খিন্না পত্নীসহকারে নিঃসহায় অবস্থায় যাইতে হয়, তাহার দুরবস্থা অনুভবেরই যোগ্য,—সে দুঃখকাহিনী যথাযথ-ভাবে বর্ণন করিবার ভাষা পাওয়া কঠিন।

ষোড়শ খৃষ্টাব্দে একদিন টিহারণ-নিবাসী মীরজা গীয়াস্‌বেগ তাঁহার অপরূপ-রূপলাবণ্যবতী গর্ভভারক্লিষ্টা যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া মোগল রাজধানী আগ্রা-নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল; এবং তাঁহার ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের মধ্যে অনেকে দস্যুকর্ত্তৃক প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল,—অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারাও ভবিষ্যৎ বিপৎপাত-ভয়ে প্রভুর সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গীয়াস্‌বেগ পারস্যের তদানীন্তন কোনও এক উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী মহম্মদ শরীফের পুত্র। পিতা সুযশের সহিত আজীবন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রভুর হিতকল্পে কার্য্য করেন, তাঁহারা অপরের অন্যায় স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন; ইহা চিরন্তন নিয়ম। সুতরাং তাঁহাদের শত্রুসংখ্যা অল্প হয় না। মহম্মদ শরীফের বহু শত্রু থাকিলেও, তাঁহার জীবিতকালে

তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারীর সহিত শত্রুতা করিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সেই সমস্ত নীচাশয় ব্যক্তি পিতার প্রতি যে বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, পুত্রের প্রতি শত্রুতা করিয়া তাহার চরিতার্থতা-সাধনের সঙ্কল্প করে ও তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। পিতার মৃত্যুর পর গীয়াস্‌বেগ তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও বিদ্যাবত্তার বলে যদিও উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তথাপি শত্রুচক্রান্তে তাঁহাকে রাজ-কোপে পড়িয়া বড়ই বিপন্ন হইতে হয়; এবং ভাবী অসীম অমঙ্গলের আশঙ্কা তাঁহার মনে প্রবল হওয়ায়, তিনি পারস্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহা যে-কালের কথা, সে সময়ে ভারতীয় মোগল-সাম্রাজ্যের ধনরত্ন-শ্রীসম্পদ-বলবিক্রম-কাহিনী পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ায়, সম্রাট্ আকবর শাহের গুণগ্রাহিতায় আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্‌দেশের বহু গুণশালী ব্যক্তি ভারতে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্রাটও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও পদগৌরব প্রদানে স্বীয় সন্নিকটে রাখিয়া তাঁহার রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রা নগরীকে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীর ন্যায় উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আকবর সেখসৈয়দ-সিয়াসুন্নি-মোগলপাঠান-হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিচারে গুণের আদর করিতেন:

তজ্জন্য সেই সমদর্শী সম্রাটের নিকট আবুলফজল ও বীরবল, ফৈজী ও টোডরমল, মানসিংহ ও মহব্বৎ খাঁ চিরকাল সমান আদরই পাইয়া আসিয়াছেন। সম্রাট্-শ্রেষ্ঠ আকবরের এই রাজোচিত দুর্লভ গুণগ্রাহিতার কথা সুদূর পারস্যবাসী গীয়াসের কর্ণগোচর হয় এবং দুঃখ-দুর্দ্দিনে যখন তাঁহার অদৃষ্টাকাশ ঘনায়মান মেঘান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন আকবরের যশোজ্যোতিকেই একমাত্র ধ্রুবতারা জ্ঞান করতঃ তিনি দুস্তর মরুবালুকা ও দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া, ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ভারতবর্ষের উদ্দেশে সস্ত্রীক যাত্রা করেন।

টিহারণ্ হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত গীয়াস্ একরূপ নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে ভারতবর্ষের পথে দস্যুকর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। তিনি কোনরূপে নিজের ও পত্নীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সর্ব্বস্বের মধ্যে কেবল একটি ভারবাহী বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ দস্যুরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। উপায়ান্তরবিরহিত গীয়াস্‌বেগ পত্নীকে সেই ষণ্ডের উপর আরোহণ করাইয়া নিজে পদব্রজে পথ চলিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরেই, পূর্ণগর্ভা পত্নী প্রসববেদনায় অতিমাত্র অভিভূত হওয়ায়, সহায়-সম্পদবিহীন গীয়াস্‌বেগ বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রমাদ গণিতে লাগি-

লেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় গীয়াস্ পত্নীকে তদবস্থ দেখিয়া এবং আসন্ন সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রয়হীন মরু-প্রান্তরে ক্লেশের ইয়ত্তা থাকিবে না ভাবিয়া, আকুল হইতে লাগিলেন। সুখের ক্রোড়ে লালিত গীয়াস-বেগম একাল পর্য্যন্ত দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না; যাহার সহিত চিরদিবসের সুখদুঃখের স্মৃতি দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সেই আজন্মের ক্রীড়ানিকেতন, প্রিয়াদপিপ্রিয় মাতৃভূমি হইতে হঠাৎ ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে নির্ব্বাসিত হওয়ায়, অন্তরে কি ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তদুপরি শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য বিজনারণ্যে গর্ভবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া স্বামীকে যে অসীম বিপদে ফেলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া, সাধ্বী মনে মনে প্রপন্নবিপদ্ভঞ্জন দয়াময় দেবতার নিকট পুনঃপুনঃ নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন;—ভাবিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলেই সবল স্বামী দ্রুতপদে পথ চলিয়া রাত্রি-সমাগমের পূর্ব্বেই কোন আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে পারিবেন; চলৎ-শক্তিহীনা আসন্নপ্রসবা রমণী সঙ্গে থাকাতেই তাঁহার বিপদের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পতিপ্রাণা ভার্য্যা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিয়া লইবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে স্বামীকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, নিরাশ্রয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রসবের কষ্টে অচিরে

তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবেই, কেবল স্বামী যদি সময় থাকিতে আশ্রয় না পান, তবে তাঁহারও মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট, রোগশোকপ্রপীড়িত, জরা-মরণসন্ত্রস্ত ধরণীমণ্ডলে অমৃতরূপিণী নারি, তুমি কাহার অনুপম সৃষ্টি? অন্নহীন ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার সময় তুমি স্বয়ং অন্নপূর্ণা;—অসহ্য রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীর শয্যাপার্শ্বে তুমি মূর্ত্তিমতী করুণা;—পরার্থে আত্মোৎসর্গ-জনিত স্বর্গের, দধীচি অপেক্ষাও তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারিণী। হিমসন্নিপাত-ক্ষুণ্ণা নিরাভরণা দীনা প্রকৃতিসুন্দরী যেমন বসন্তের করস্পর্শে বর্ষে বর্ষে পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে ও কোমল কিশলয়-শোভায় পরি-শোভিতা হইয়া লোকলোচনের আনন্দ-সম্পাদন করে, তেমনি মানবের হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত, স্বার্থ-পরিপূরিত, কুলিশ-কঠোর ও অনুর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে নন্দনের পুষ্প-সমাকুল কল্পলতিকার বিকাশের যে আভাস আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি তাহা, হে নারি, তোমারই সুধাময় স্নেহস্পর্শের বিস্ময়করী শক্তির অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি। যে নারী জীবনমরণের সন্ধিস্থলে আসন্নমৃত্যুর সম্মুখে সহাস্যবদনে ও অকুতোভয়ে দাঁড়াইতে পারে, এবং আত্ম-হিতাহিতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বামীর কল্যাণ-কামনায় বিজনারণ্যে নির্ব্বাসনের বিভীষিকাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে, সেরূপ দেবীপ্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিবার

মত বর্ব্বরতা গীয়াসের ছিল না। যে পৌরুষের প্রেরণা তাঁহাকে সুদূর পারস্য হইতে ভাগ্য অন্বেষণে ভারতবর্ষে আনিতেছিল, উহাই তাঁহাকে বিপদকালে অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী-ত্যাগের প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। গীয়াস্‌বেগ স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, সুপ্রসব বা পত্নীর প্রাণবিয়োগ যাহাই হউক, তাহার জন্য নীরব ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুঃখের দিন সকল সময়ে সকলের নিকটেই সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। রোগশয্যাশায়ী ব্যাধিপীড়িতের রাত্রি আর প্রভাত হয় না;—নিরম্বু-উপবাসব্রতধারিণী হিন্দু-বিধবার হরিবাসরের দিনের অবসান হইয়াও হইতে চাহে না। সহায়-সম্পদ-বিহীন পথিক-দম্পতীরও আজ সেই অবস্থা। দুঃস্থের দিন যত দীর্ঘই মনে হউক, দিন কাহারও দুঃখের সাক্ষী হইয়া চিরকাল বসিয়া থাকে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। গীয়াসপত্নী দুঃসহ প্রসব-বেদনায় শুশ্রূষার অভাবে অচেতন হইয়া পড়িলেন বটে; কিন্তু তদবস্থাতেই তাঁহার এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা ভূমিষ্ঠা হইল। এই কন্যাই আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত মহৈশ্বর্য্যময় মোগল-সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের জীবিতরূপিণী ভবিষ্যৎ-মহিষী নূরজাহান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

যে বস্তু এক সময়ে হৃদয়ানন্দকর, সময়বিশেষে তাহাই আবার যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠে। পারস্যের ধনী ওমরাহের আদরের পুত্রবধূ যদি স্বদেশে সম্পদের সময়ে সন্তানবতী হইতেন, তবে সে দিন কি আনন্দের দিনই হইত! আজ অবস্থার বিপর্য্যয়ে সম্পদহীনা রমণী নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গরিমা জননীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, মাতৃহৃদয়ের বিমলানন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যার জীবন-রক্ষা পিতামাতার বিষম সমস্যা হইয়া উঠিল। অনাহারক্লিষ্টা পথশ্রান্তা রমণী প্রসবের পরে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের পথ চলাই অসম্ভব, তাহার উপরে সন্তান বহন করা তাঁহার পক্ষে কল্পনাতীত দুঃসাধ্য কর্ম্ম। শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কঠোর নিষ্পেষণে, অনশনে ও পথশ্রান্তিতে নিরতিশয় দুর্ব্বল জননীর সদ্যোজাত শিশুর প্রাণরক্ষার্থ যথেষ্ট পরিমাণ স্তন্য দিবার ক্ষমতাও ছিল না!

সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময় বিশ্বরাজ্যে দুঃখ-শোকের ভীষণ অভিনয় দেখিয়া, সময়ে সময়ে সসীম

মানববুদ্ধি যদি তাঁহার মঙ্গলেচ্ছার প্রতি সন্দিহান্ হয়, তবে বোধ করি তাহার সে অপরাধ ক্ষমার্হ। কর্ম্মফল-বাদী যুগযুগান্তের ও জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত কর্ম্মভার দুর্ব্বল মানবের স্কন্ধে চাপাইয়া, তাহার ভাগ্যবিধাতাকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছেন। সেই কর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে, "অনবস্থা" দোষ দিয়া, দার্শনিকগণ সকল তর্ক নিরস্ত করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্যগণ বিশ্বসৃষ্টির প্রতি ভগবল্লীলাকেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, তাপত্রয়বিমূঢ় জীবকে পরম গম্ভীরভাবে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন— "আনন্দেই জন্মিয়াছ, আনন্দেই আছ এবং আনন্দের মধ্যেই পুনরায় প্রবিষ্ট হইবে।" এ যে কি আনন্দ, তাহা সেই আনন্দময়ই জানেন; তাহার "পরোক্ষ" বা "অপরোক্ষ" কোন স্বাদই ত প্রায় কেহ পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে আনন্দময় যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই চারিটি আনন্দ হরির-লুটের মত তাঁহার এই আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট সংসারে ছড়াইয়া দিতেন, তবে বোধ করি এই চিরদিনের 'ত্রাহি-ত্রাহি'-রব কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইতে পারিত।

দুঃস্থ দম্পতী নানারূপ চিন্তা করিয়াও, সন্তান লইয়া নিরাপদ হইবার কোনও উপায়ই উদ্ভাবিত করিতে পারিলেন না। অগত্যা সেই সদ্যোজাত কন্যাকে হিংস্র জন্তু-নিষেবিত বিজন পার্ব্বত্যারণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইলেন।

জননীর পক্ষে গর্ভজাত সদ্যঃপ্রসূত অসহায় সন্তানকে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বিসর্জ্জন দেওয়া কি ভয়ানক মর্ম্ম-ভেদী যাতনার ব্যাপার, তাহা মাতৃহৃদয় ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না।

শিশু-কন্যাকে পথিপার্শ্বস্থ তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর শয়ন করাইয়া, পিতামাতা অতি কষ্টে তাঁহাদের দেহভার বহন করিয়া, আশ্রয় অন্বেষণের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যতক্ষণ সন্তানটিকে দেখা গেল, মাতা সেই দিকে পলকহীন চক্ষু রাখিয়া কোনমতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শিশু চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র মাতৃহৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। গীয়াস-পত্নীর মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন সেই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশ শোকাকুলিত করিয়া তুলিল। তিনি সন্তান লইয়া আসি-বার নিমিত্ত স্বামীকে পুনঃপুনঃ সকাতর অনুনয় করিতে লাগিলেন। গীয়াসও শিশুর পিতা, সন্তান বিসর্জ্জনের মর্ম্মন্তুদ ভীষণ যাতনা তাঁহাকেও নিরতিশয় পীড়ন করিতে-ছিল; কেবল প্রাণরক্ষার জন্যই ঐরূপ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্ত্রীর সকা-তর বিলাপধ্বনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি শিশু-সন্তানকে আনিবার জন্য একাকী ফিরিয়া চলিলেন।

কথিত আছে, গীয়াস যেস্থানে বালিকাকে ত্যাগ

করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তথায় ফিরিয়া আসিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া, ভয়ে বিস্ময়ে হতচেতন হইয়া পড়িতেছিলেন। বৃক্ষপল্লবহীন তৃণশষ্পবর্জ্জিত আফগান-প্রদেশের মরু-পর্ব্বতে সূর্য্য-কিরণ কিরূপ প্রচণ্ড, যাঁহারা সে প্রদেশে একবার গিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। অপরাহ্নের অস্তগমনোন্মুখ রবিরশ্মিপাত হইতে বালিকার নবনীতকোমল ক্ষুদ্র দেহকে রক্ষা করিবার জন্য এক বিপুলকায় বিষধর সর্প তাহার বৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, অথচ শিশুর কোন অনিষ্টই করে নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া কিয়ৎকাল গীয়াসবেগ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন; অগ্রসর হইবেন কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। যে করুণাময় ভগবানের অপার কৃপায় শিশু বিজনারণ্যে নিরাপদে জন্মলাভ করিয়াছে, যাঁহার অপরিসীম মহিমায় বিষধর হিংস্র সরীসৃপ পর্য্যন্ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, শিশুর ক্লেশ লাঘবের জন্য ফণাবিস্তার করতঃ রৌদ্ররশ্মির গতিরোধ করিতেছে, সে তাঁহারই অপার কৃপায় কোনরূপ অনিষ্ট করিবে না,—ইহা গীয়াসের ধ্রুব-ধারণা হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সর্প বালিকার নিকট হইতে সরিয়া

পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যে প্রস্থান করিল। * গীয়াসও কন্যাকে বক্ষে ধারণ করতঃ দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া বালিকার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।

বিধাতার বিচিত্র বিশ্বে যে সকল সন্তানসন্ততি নানারূপ প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, প্রায়শই দেখা গিয়াছে, সেই সকল বালকবালিকা পরিণত জীবনে নিজ ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের বলে পৃথিবীতে স্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে। ভূভারহারী বৈকুণ্ঠবিহারী দৈত্যনিসূদন পুরুষোত্তম প্রহরীবেষ্টিত কংসকারায় জন্মগ্রহণ করিয়া, গোপনে নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; দ্বাপর যুগের কুরুপাঞ্চালের ইতিহাস তাঁহারই গৌরবগাথায় পরিপূর্ণ।—এ ত গেল পুরাণপ্রোক্ত কাহিনী; অনেকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেও পারেন। শের শাহের বিক্রমবিজিত পলায়নপর হুমায়ুনের জগদ্‌বিখ্যাত নন্দন আকবর শাহ মরুপ্রান্তরস্থিত অমরকোটের জনহীন দুর্গে পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচিত হন। পরাজিত, লাঞ্ছিত,

* সদ্যোজাত শিশুর দেহে পতিত আতপতাপ নিবারণার্থ সর্পের ফণাবিস্তার কেবল নূরজাহানের নহে, তাহার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক লোকোত্তর-চরিত্র নরনারীর সম্বন্ধে এইরূপ এবং অন্যান্য প্রকারের অতিমানুষ গল্প প্রচলিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তীর যথাযোগ্য মূল্য পাঠকপাঠিকাগণ স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।

সৌভাগ্যবিচ্যুত হুমায়ুন অল্পসংখ্যক অনুচরবর্গকে আনন্দের দিনে কি উপঢৌকন দিবেন ভাবিয়া পান নাই। অন্য কোনরূপ মূল্যবান পদার্থের অসদ্ভাবে কিঞ্চিৎ মৃগনাভি তাহাদের মধ্যে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। মৃগনাভির সগন্ধ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ নবকুমারের যশোরাশিও দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হউক বলিয়া হুমায়ুনের বিশ্বস্ত অনুচরেরা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রসাদ-ভিক্ষা করিয়াছিল; এবং তাহাদের সেই আন্তরিক প্রার্থনাও সর্ব্বসিদ্ধিদাতার চরণতলে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।—ক্ষুদ্র কর্সিকা দ্বীপের অতিক্ষুদ্র গৃহে বোনাপার্টের জন্ম হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ইতিহাস নেপোলীয়নের গৌরবময় সামরিক কাহিনীতে অতিমাত্রায় মুখরিত। এ প্রকার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। বর্ত্তমান কালেও এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সদ্যঃপ্রসূতা জননী গীয়াস-বেগম উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত সন্তান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া শিশু সহকারে নিরাপদ আশ্রয়ে পঁহুছিবেন, ভাবিয়া তাহার কোন সিদ্ধান্তই করিতে পারিতেছিলেন না। যে অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির মঙ্গলময় প্রভাবে বিশ্বজীবের সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহারই কৃপায় সৃষ্টজীব জীবনোপায় লাভ করিয়া থাকে,—ইহা

অবিসম্বাদিত ও সুনিশ্চিত মহাসত্য। গীয়াস-দম্পতীর দুঃখদুর্দ্দিনে তাঁহারা সেই চিরন্তন সত্যকে আবার নূতন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। হর্ষবিষাদের সন্ধিস্থলে সন্তানসহ দণ্ডায়মান হইয়া, দুঃস্থ দম্পতী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ও অশ্ব-উষ্ট্রাদির পদশব্দ তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—কতকগুলি ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া অনুচরবর্গ সহ জনৈক সওদাগর উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, ঐ পথেই অগ্রসর হইতেছেন। ভয়সঙ্কুল জনহীন পার্ব্বত্য মরুপথে যাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, হঠাৎ মনুষ্যসমাগমে আশ্রয়লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, তাঁহাদের মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আগন্তুক তাঁহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উষ্ট্র হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—"আমি দূর হইতে আপনাদের দুরবস্থা দেখিয়াছি; অপরিচিতের সান্নিধ্যে আপনার সহধর্ম্মিণীর প্রসবকালে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, এতক্ষণ দূরে অবস্থান করিতেছিলাম। গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান অনুসারে জাতজীবের ভবিষ্যৎ-জীবনের শুভাশুভ কথঞ্চিৎ গণনা করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে গণনা করিয়া

দেখিয়াছি যে, আপনাদের শিশু যে মুহূর্ত্তে জন্মিয়াছে, যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য হয়, তবে তাহার ফলে কালে এই কন্যা বসুন্ধরার একচ্ছত্রাধিশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন ; ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস বোধ করি আপনারাও পাইয়াছেন। আপনাদের পরিত্যক্তা শিশুকে ভয়ঙ্কর হিংস্র বিষধর সর্প কিরূপভাবে রক্ষা করিতেছিল, তাহা আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ত্যক্ত বালিকাকে আমিই লইয়া পলায়ন করিব মনে করিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে আপনি ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আপনার কোথায় যাইবার অভিলাষ বলুন, আমি যথা-সাধ্য তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। যে পর্য্যন্ত আপনারা নিরাপদ স্থানে না পঁহুছিতে পারিবেন, অনুগ্রহ করিয়া কন্যাসহ আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন।”

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মস্তকোপরি মৃত্যুর উদ্যত ভীমদণ্ড যাঁহারা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, নিষ্ঠুর কালের করাল হস্ত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অকরুণভাবে যাঁহাদের দিকে প্রসারিত হইতেছিল, তাঁহারা এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানের অযাচিত করুণাকে ঈশ্বরের দয়া জানিয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, শুভসম্পদ্‌দাতা ভয়ত্রাতা ভগবানের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করিতে লাগিলেন ; এবং

অপরিচিত মহাপুরুষকে তাঁহাদের অবস্থা এবং তাঁহারা যে ভারতবর্ষের সম্রাট্-শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী আকবর শাহের আশ্রয়লাভের আশায় আগ্রায় যাইতেছিলেন, তাহাও সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও জীবন-রক্ষককে পুনঃপুনঃ শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। যিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মালিক মাসুদ। তিনি ব্যবসায়-ব্যপদেশে কাবুল পারস্য কান্দাহার হীরাট ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে গতায়াত করিয়া থাকেন; এবং মোগলগৌরব-রবি আকবর শাহের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনিই তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভারতবর্ষে লইয়া যাইবেন এবং সম্রাটের দরবারেও পরিচিত করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন।

সম্রাটের নিকট পরিচিত হইতে পারেন বা নাই পারেন, অনশনে অর্দ্ধাশনে নিরাশ্রয়ে পর্য্যটনজনিত দুঃসহ ক্লেশে, সদ্যঃপ্রসূতা বালিকা জীবিতা থাকিয়া যৌবনারম্ভে একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বরের প্রিয়তমা হইতে পারেন বা নাই পারেন, তৎকালে তৎপ্রতি গীয়াসের কিম্বা তাঁহার পত্নীর মনোযোগ দিবার অবসর ছিল না। তাঁহারা যে বর্ত্তমান উপায়হীন অবস্থায় অপরিচিতের অনুকম্পা লাভ করিয়া আপাততঃ জীবনরক্ষা করিতে পারিলেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি বিধাতার

অসীম অনুগ্রহের ফল বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের উদ্দেশে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৌবন সমাগমে

মালিক মাস্থদের আশ্রয়ে যান, বাহন, আহার্য্য—কোন বিষয়েই গীয়াসের বা তৎপত্নীর কোন অসদ্ভাব হয় নাই। পথিমধ্যে নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে আশ্রয়দাতা উপকারী বন্ধুর সহিত তাঁহারা তাঁহাদের বহুকালের কল্পলোক, আকবরের আনন্দময় আগ্রা নগরীতে 'নওরোজ' দিনে প্রথম পদার্পণ করিলেন।

আকবরের 'নওরোজ' ইতিহাস কীর্ত্তিত, অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব আনন্দের দিন। নববর্ষের নব-অরুণ-আলোকিত নবীন উষার প্রথম সমাগমকাল হইতেই নাগরিক নরনারী নানারূপ উৎসবের উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত। নীলসলিলা যমুনার সুবিমল ও বিস্তীর্ণ সৈকতে রক্তপাষাণ-প্রাকার-পরিবেষ্টিত, সম্রাটের আবাস-দুর্গের অভ্রভেদী প্রাসাদশীর্ষ বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত পতাকা-শ্রেণী-পরিশোভিত হইয়া কি অপরূপ শ্রী ধারণ করিত, তাহা যে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

সুপ্রশস্ত রাজপথে বিচিত্র পরিচ্ছদধারী রাজপুরুষ-

দিগের সহর্ষ-সমাগমে, শস্ত্রভৃৎ সৈনিকবৃন্দের সদর্প পাদবিক্ষেপে, গন্ধর্ব্বগর্ব্বগঞ্জিনী কিন্নরকণ্ঠী গায়িকাবৃন্দের সুধাসিক্ত গীতিঝঙ্কারে নিয়ত মুখরিত আগ্রা নগরী গীয়াসের চক্ষে স্বপ্নময় পরীরাজ্য বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। 'নওরোজের' আম-দরবারে সিংহাসনাধিষ্ঠিত শাহানশাহ আকবর শাহের সৌম্যমূর্ত্তি, সম্মুখে পাত্র-মিত্র আমীর ওম্‌রাহ সচিব সেনাপতি প্রভৃতির সসম্ভ্রম অবস্থান, সামন্ত রাজন্যবর্গের যথাযথ সম্বর্দ্ধনা, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিদ্বজ্জনের প্রতি সম্রাটের সমদৃষ্টি, সমস্তই সুদূর পারস্যবাসী গীয়াসের অন্তরাত্মাকে আকবরের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট করিয়া তুলিল; এবং সর্ব্বজন-বন্দিত সম্রাট্-শ্রেষ্ঠের বন্দনবচনার্দ্ধ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রচনাকে তিনি কৈতববাদ বলিয়া উপেক্ষা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না।

গীয়াসের গুণগৌরবের পরিচয় পাইতে গুণগ্রাহী আকবরের অধিক বিলম্ব হয় নাই। সম্রাটের পরলোক-গত পিতা হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে শের শাহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইবার পর আশ্রয়লাভের ও বলসঞ্চয়ের আশায় পারস্যে গমন করেন। পারস্যে অবস্থানকালে তিনি তথাকার সম্রাটের নিকট হইতে সাদর আতিথ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত যে সমস্ত কর্ম্মচারী পারস্যের শাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন,

গীয়াসের পিতা মহম্মদ সরীফ তাঁহাদের একতম ছিলেন। এই সংবাদ আকবর শাহের কর্ণগোচর হইবার পর তৎ-পুত্র গীয়াস্‌বেগের উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। ক্ষমতানুরূপ পদগৌরব লাভ করিয়া গীয়াস সপরিবারে আগ্রায় পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন; এবং সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া তিনি সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে এৎমাদ-উদ্দৌলার পদে উন্নীত হইলেন।

গীয়াসের যে কন্যা আফগান প্রদেশে মরুপ্রান্তরে জন্মলাভ করেন, তাঁহার মেহের-উন্নিসা নামকরণ করা হয়। কালে কৈশোরোত্তীর্ণা ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা মেহেরের অনবদ্য সৌন্দর্য্যের কথা আগ্রা নগরীর ওমরাহদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কলানিপুণা কুমারী মেহের-উন্নিসার পাণিপীড়নপ্রার্থী হইয়া, আগ্রার ওমরাহগণ গীয়াসের নিকট আবেদন জানাইতে লাগিলেন। গীয়াস বিশেষ বিবেচনা করিয়া, মত্তবারণ-বলশালী যোদ্ধৃকুলবরেণ্য বাহুবলদৃপ্ত পারসিক বীর আলীকুলী বেগকে ভবিষ্যৎ জামাতৃপদে মনোনীত করতঃ প্রিয়তমা কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখিলেন।

তৎকালে ভারতবর্ষীয় মুসলমান-সম্প্রদায় মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না; এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এই শাস্ত্র-

শাসনের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধাও প্রদর্শিত হইত। গীয়াস তাঁহার অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যবতী প্রাণাধিকা দুহিতাকে নানাবিধ বিদ্যা, সঙ্গীত, শিল্পচিত্রাদি বহুবিধ কলাশাস্ত্রে নিপুণা করিবার যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুমারী মেহের-উন্নিসাও স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে যাবতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া, পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

গীয়াসের পরিবারস্থ রমণীগণ সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময়ে সময়ে রঙ্গমহলে গতায়াত করিতেন এবং আনন্দ উৎসবের দিনে সম্রাজ্ঞীর অনুজ্ঞাক্রমে গীয়াসপত্নী কখন কখন কন্যা মেহের-উন্নিসাকে সঙ্গে লইয়াও রঙ্গমহলে গমন করিতেন। এ যে সময়ের কথা, শাহজাদা সেলিম তখন কৈশোরের প্রান্তসীমা বা যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শেখ সেলিম ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ বলিয়া তাৎকালিক সকল লোকেরই ধারণা ছিল। স্বয়ং সম্রাট্ আকবর শাহ্ ফকীরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত ফতেপুর সিক্রীতে রাখিয়াছিলেন। পুত্রকামী আকবর, মওলানা ফকীর সেলিম চিস্তির অনুগ্রহে প্রথম এই পুত্রলাভ করেন এবং সেই কারণে শাহজাদার নাম সেলিম রাখা হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী তৎকালে প্রচলিত ছিল

যে, ঈশ্বরানুকম্পায় পুত্রলাভ করিয়াছেন বলিয়া সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞী উভয়েই শাহজাদাকে নিরতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহার চরিত্রগঠন ও শিক্ষাকল্পে উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটি না থাকিলেও, স্নেহাধিক্যবশতঃ কোনরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। উত্তরাধিকার-সূত্রে শাহজাদা সম্রাটের নির্ম্মল চরিত্রের অনেক গুণ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহ-দুর্ব্বল পিতার নিকট পরিমাণাতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া তিনি রাজোচিত সংযম শিক্ষা করিতে পারেন নাই।

সংসারস্থ জীবমাত্রেরই সুখভোগেচ্ছা সহজাত। সর্ব্বপ্রকার দুঃখের একান্ত উচ্ছেদসাধন ও নিরতিশয় সুখের মধ্যে আপনাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিমজ্জিত রাখিবার বাসনা জীবকে নানারূপ চেষ্টা ও উদ্যমে নিয়োজিত রাখিয়াছে। বিমল-বিপুল-বুদ্ধি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বোধ করি ইহাকেই "কর্ম্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই কর্ম্মেরই ফলভোগ করিবার জন্য অনন্তকাল ধরিয়া জীব জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রব করিতেছে। দিব্যজ্ঞান-বলে যাঁহারা জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ, করতলগত আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইতেন, তাঁহারা পুনঃপুনঃ বাসনার অযথা প্রশ্রয়দানকে দুঃখের নিদান বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ঘৃতাহুতিতে যেমন নির্ব্বাপিত হয়

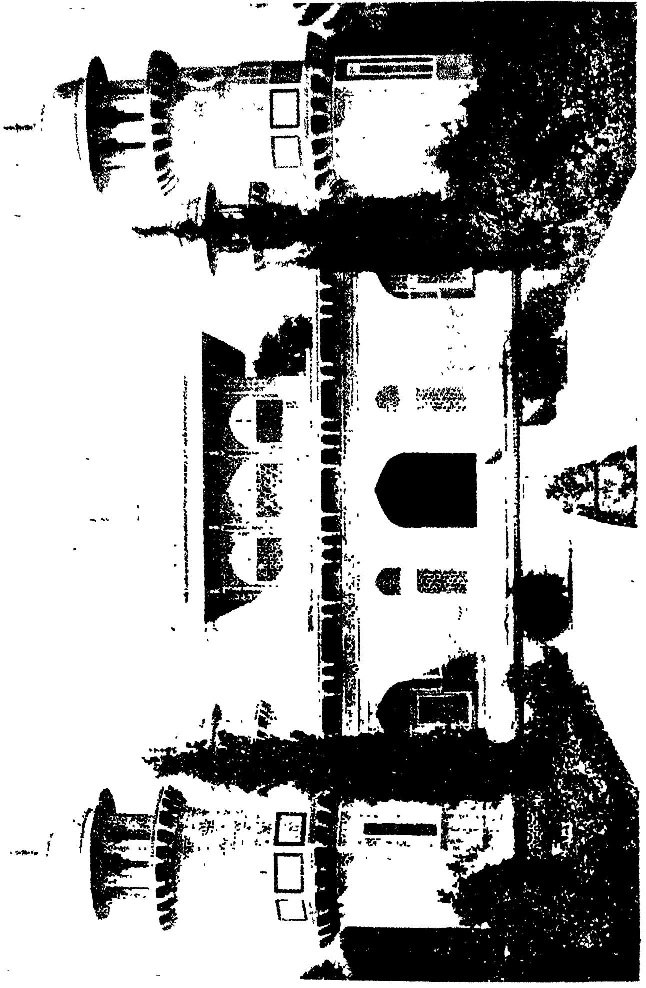
না, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার বাসনার সর্ব্ববিধ উপায়ে পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা বাসনাকেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া দেয়,—মানবকে সুখী করিতে পারে না। এই চিরপ্রচলিত সনাতন সত্য শাহজাদার হৃদয়ে উদ্বোধিত হইতে না পারায়, বাসনার উদ্দাম উন্মাদনা তাঁহাকে কখন কখন উৎপথে লইয়া যাইত; এবং এই উন্মার্গগামী রাজকুমারের উন্মত্ত ব্যবহারে তাঁহার সাগরান্ত-সাম্রাজ্যও সময়ে সময়ে ভীত চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত।

সম্রাজ্ঞীর আহ্বান অনুসারে একসময়ে গীয়াসপত্নী যখন কন্যাসহ রঙ্গমহলে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে দৈবনির্ব্বন্ধে যুবরাজ সেলিমের সহিত যৌবন-সমাগম-চঞ্চলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মেহেরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দিল্লীর রঙ্গমহল রমণীরূপের ভাণ্ডার। তুরুস্ক, পারস্য, মিশর, জর্জ্জিয়া, সারকেসিয়া প্রভৃতি নানা দেশের নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শরূপিণী রমণীগণ দিল্লীর রঙ্গমহলে স্থান পাইতেন। ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ যৌবনবিহ্বল যুবরাজের মনস্তুষ্টির জন্য রঙ্গমহলে নৃত্যগীত-কুশলা সুন্দরী নারীর অভাব ছিল না; কিন্তু কুমারী মেহের-উন্নিসার সঙ্গে শাহজাদার কি শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল বলা যায় না,—প্রথম দর্শনাবধিই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরনেত্রসমুত্থিত দুর্ব্বার-বহ্নি-বিদগ্ধ ভস্মাবশিষ্ট কন্দর্প

নামক কৌতুকপ্রিয় চিরকিশোর দেবতাটি দেবলোকে আর কোন উৎপাত ঘটাইয়া থাকেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার বজ্রকঠোর পুষ্পবাণের প্রবল প্রতাপে মর্ত্ত্যধামে মধ্যে মধ্যে যে মহা উৎপাত সংঘটিত হয় তাহার উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। সাধ্বীশিরোমণি জনকদুহিতা সীতা দেবীর রূপবহ্নির দুর্দ্দম-দাহে রাবণের সবংশধ্বংস,—সে কাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতার পরিজ্ঞাত। গ্রীক্ সুন্দরী হেলেনার প্রণয়লোলুপ অতিথির অনাচরণীয় দুষ্কৃতকারী, পরদারাপহারী প্যারিসের পাপে ট্রয় জনপদের শোচনীয় পরিণাম; রাজপুতকুললক্ষ্মী পরমলাবণ্যবতী পদ্মিনীর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মুসলমান সম্রাটের অমানুষ অত্যাচারপ্রপীড়িত রাজপুত নরনারীর লোমহর্ষণ মৃত্যু —কন্দর্প-দেবতার কুৎসিত ক্রীড়ার লজ্জাজনক ইতিহাস!

রূপমুগ্ধ রাজকুমার মেহের-উন্নিসার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া, স্বতঃ পরতঃ তাঁহার জননী সম্রাজ্ঞীর নিকট সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের অনুজ্ঞা ও অভিমত ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না জানিয়া, তিনি যথাবিহিত উপায়ে এবং যথাসময়ে সম্রাটের নিকট পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। তৎপূর্ব্বে শাহজাদা সেলিম, আকবর শাহের প্রচলিত নিয়মানুসারে এক রাজপুত-কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে একাধিক বিবাহ



নিষিদ্ধ নহে, তথাপি কামবৃত্তির বশীভূত হইয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করা আকবরের ন্যায় নীতিমান্ ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাটের অনুমোদিত ছিল না। তদুপরি, তিনি যখন গীয়াসের নিকট জানিতে পারিলেন যে কুমারী মেহের-উন্নিসা বাগ্‌দত্তা এবং উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিয়াই গীয়াস কন্যাদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন তাঁহার তুল্য ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের নিকট, স্বীয় পুত্রের কামেচ্ছাকে সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার উপযুক্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল না।

মুসলমানকুলতিলক নীতিপরায়ণ সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবর শাহের রাজসভায় যে সমস্ত পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, সভাসদ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান ও সন্নীতিপরায়ণ। উৎসবে ব্যসনে সকলের নিকট হইতেই বাদশাহ সদুপদেশ লাভ করিতেন। পুত্রের রূপমোহ ও মেহের-উন্নিসাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, অসামান্য পণ্ডিত ও মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ আবুল ফজলের নিকট তিনি তাহার পরামর্শ চাহিলেন। উভয়ে বহু বিবেচনা করিয়া, এ বিবাহে মত না দেওয়াই স্থির করিয়া, প্রলোভনের উপাদান অসামান্যা সুন্দরী কুমারী মেহের-উন্নিসাকে কুমারের চক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য তাহাকে পাত্রস্থা করিয়া, আগ্রা হইতে কোন সুদূর প্রদেশে পাঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

নিজের আকাঙ্ক্ষিত রমণীরত্ন অন্যের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে, সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া ইহা দেখা অতি-বড় ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভবপর নহে। সুতরাং বাদশাহ ও আবুল ফজল রাজকার্য্যব্যপদেশে শাহজাদাকে রাজপুতনায় প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন; মনে মনে আশা করিলেন, দূরদেশে সামরিক গৌরবলাভে উৎফুল্ল রাজকুমারের হৃদয় হইতে মেহেরের প্রতি ক্ষণিকের অনুরাগ বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুৎরেখার ন্যায় চকিতেই বিলীন হইয়া যাইবে।

হায় মানবের ভ্রান্ত বুদ্ধি! বিধাতার ইচ্ছায় যাহা সংঘটিত হইবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি আছে যে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, তাঁহার ইচ্ছার গতিরোধ করে? সর্ব্বকার্য্যকারণের নিয়ামক বিশ্বরাজ্যের একাধীশ্বর বিধান করিয়াছিলেন যে, এক-দিন এই বালিকা মেহের-উন্নিসাই জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে ভারতবর্ষের মণিময় সিংহাসনে বসিয়া, ভারতবাসী ত্রিংশৎকোটি নরনারীর ভাগ্যচক্র স্বেচ্ছায় নখাগ্রে ঘুরাইয়া, তাঁহার জীবন-নাটকের অভিনয় করিবেন; আকবর বা আবুল ফজলের কি সাধ্য যে তাঁহাদের সসীমবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার গতিরোধ করেন!

আদর্শসম্রাট্ আকবর শাহ বীর্য্যবলে শত্রুজয় করিয়া

পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন, শাসনকৌশলে ও সৌজন্যবলে বিজিতদেশের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে প্রীতির সিংহাসন সংস্থাপিত করিয়া তাহার উপর নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ও নিষ্কণ্টকে উপবেশন করিয়াছিলেন,—কিন্তু রমণীর অপাঙ্গনির্জ্জিত যৌবন-মোহমুগ্ধের অকরণীয় জগতে কিছুই থাকে না,—এই চিরন্তন সরল সত্য তাঁহার বিশাল বুদ্ধির গোচরীভূত হয় নাই। মানবহৃদয়ের অন্তস্তলদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঋষির অতলস্পর্শ জ্ঞানসমুদ্র মথিত হইয়া,

গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞাতাস্ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
চতুর্থী স্ত্রী-সুরা নাম যয়েদং মোহিতং জগৎ॥

যে মানব মনস্তত্ত্বের মহাসত্য উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার সারবত্তা আকবর শাহের হৃদয়ে পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত হইলে তাঁহার ন্যায় ধীমান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ভাবীসম্রাটের ঐকান্তিক ইচ্ছার গতিরোধার্থ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃজন করিয়া মেহের-উন্নিসার হতভাগ্য স্বামীর প্রতি জাহাঙ্গীরের উদ্ধত বিদ্বেষকে চিরদিনের জন্য উদ্যত করিয়া না রাখিতেও পারিতেন। যাহা হইবার তাহা হইবেই; হৈমহরিণের অস্তিত্ব অসম্ভব জানিয়াও যখন অন্তর্যামী রামচন্দ্র তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, তখন আকবর অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের সূচনা করিয়া রাখিবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

আগ্রা হইতে রাজকুমারের অনুপস্থিতিকালে, মেহের-উন্নিসার সহিত বীরবর আলীকুলী বেগের বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া সম্রাট্ আকবর শাহ তাঁহাকে বঙ্গের সুবাদারের অধীন বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। নবদম্পতীকে সেলিমের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শিশুর ন্যায় সরলহৃদয় আলীকুলীর সুস্থ সুন্দর দেহে শতহস্তীর বল, রণক্ষেত্রে তাঁহার পরাক্রম প্রতিপক্ষের বিষম ত্রাস, সম্রাট্ আকবর শাহের তিনি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, রাজবাঞ্ছিতা মেহের-উন্নিসা তাঁহার নবোঢ়া পত্নী,—সংসারে সুখী হইবার সমস্ত উপাদানই তাঁহার ছিল; কিন্তু জীবিতকাল পর্য্যন্ত তিনি যথার্থ সুখে দিন কাটাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আজও পর্য্যন্ত মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। মতভেদের কারণও আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক স্পষ্ট না হইলেও ইঙ্গিতে বলিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র মেহের-উন্নিসার রূপ দেখিয়াই শাহজাদা সেলিম মুগ্ধ হন নাই; যুবজনের চিত্ত-হরণোপযোগী নারীসুলভ হাব-ভাব-কটাক্ষের জাল

বিস্তার করিয়া মেহের যুবরাজের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। একথা বিশ্বাস করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, আকবর শাহের প্রযত্নে ও গীয়াসের প্রতিশ্রুতির বলে, আলীকুলীর সহিত মেহের-উন্নিসার মন্ত্রপাঠ করিয়া উদ্বাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু যুবরাজ সেলিমের প্রতি অনুরাগিণী মেহেরের, আলীর সহিত প্রণয়-মিলন ঘটিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, নিজে যত্ন করিয়া মেহের-উন্নিসা সেলিমকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিলেও, সেলিমের প্রতি মেহেরের আকৃষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। মেহের যখন রংমহলে গতায়াত করিতেন তখন তিনি নিতান্ত বালিকা ছিলেন না; পরিণত-বয়স্কা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের দূরদৃষ্টি তাঁহার না জন্মিয়া থাকিলেও, হিমাদ্রির তুষারমণ্ডিত শীর্ষপ্রদেশ হইতে বিন্ধ্যাচলের পরপার পর্য্যন্ত এবং "সোমনাথ" হইতে "চন্দ্রনাথ" অবধি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরের মহিষী হওয়া যে কোন নারীর পক্ষে পরম গৌরবজনক ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার ছিল; এবং আগ্রায় অবস্থানকালে চক্ষের উপরে মোগল বাদশাহের পর্য্যাপ্ত সম্পদগরিমা এবং অপরিমিত বলবিক্রমের নিত্য পরিচয় পাইয়া, সেলিমের অপেক্ষা আলীর প্রতি অধিক অনুরাগিণী হওয়া মেহেরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রথম

যৌবনসমাগমে দুর্ব্বার মকরকেতু যখন নারী-হৃদয়ের উপর ক্রমে ক্রমে আপন অধিকার বিস্তার করিতে থাকেন, সংসারানভিজ্ঞ কিশোরীর মনে রূপের আকর্ষণ তখন স্বভাবতঃই বড় প্রবল হয়, এবং সহস্রগুণে গুণবান্ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রূপবানের পদতলে আত্মবলি দিবার জন্য নারীর অন্তঃকরণ অধীর হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় অনিন্দ্যসুন্দরবপুঃ দেবকান্তি রাজকুমার সেলিমের রূপতরঙ্গ, আগতযৌবনা মেহের-উন্নিসার হৃদয়তটে আঘাত করিবে ইহা বিচিত্র নহে।

সসর্প গৃহে অবস্থান এবং অন্যাসক্তা নারীর পাণি-গ্রহণ, উভয়ই সমান বিপজ্জনক। সেই ভাবী বিপদের আশঙ্কা আলীকুলীকে ব্যাকুলিত করিয়াছিল কি না নিঃসন্দেহরূপে জানা যায় না, তবে তিনি আপাততৃপ্তির আশায় বর্দ্ধমানে সংসার পাতিয়া কিছুদিন নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিয়াছিলেন বটে। আকবর শাহের জীবমানে বিশেষ উৎপাত ঘটিতে পারিবে না ইহাই তাঁহার সাহস, নচেৎ ভাবী সম্রাটের প্রণয়ার্থিনীকে গৃহে আনিবার মত স্পর্দ্ধা সহসা হওয়া কঠিন।

আকবর শাহ ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া সমস্ত রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করতঃ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যাতেও তাঁহার রূঢ় হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ব্যাপারে

তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবমানেই তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আলী-কুলী তাঁহাদের উভয়ের অবিমৃশ্যকারিতার ফলভোগ যথাবিহিতরূপেই করিয়া গিয়াছেন।

ভারতসাম্রাজ্যের ইতিহাস এই সময় কিছু জটিল হইয়া পড়িয়াছিল ; এবং বৃদ্ধ সম্রাট্ আকবর শাহ স্বীয় পুত্রগণের পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া স্তব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। দাক্ষিণাত্যে আমেদনগর, বিজাপুর প্রভৃতি নিজ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। যুবরাজ মুরাদ ও ড্যানিয়াল বর্ষ বর্ষ ধরিয়া বহু সৈন্য ও অর্থের অপচয় সেখানে করিতেছিলেন। কেবল তাহাই নহে ; সুরাদেবীর অত্যধিকমাত্রায় উপাসনা করিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর বিশেষ আস্তাড়নও চলিতেছিল। এদিকে মেহের-উন্নিসার সান্নিধ্য হইতে যুবরাজ সেলিমকে দূরে রাখিবার জন্য রাজা মানসিংহকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে রাজপুতনার সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পাঠাইলেন, কিন্তু মন্মথশরাহতের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর কতদূর নির্ভর করা যায় তাহা সম্যক্ বিবেচনা করিলেন না ; ফলে হইল যে, রাজা মানসিংহের সহিত কলহ করিয়া, তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া যুবরাজ তাঁহার অনুগত সৈন্য ও কুকার্য্যের সহকারী পারিষদবর্গ সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে

আসিয়া নিজ নামে মুদ্রাপ্রচলন ও নিজকে সম্রাট্-রূপে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে এই সব শুভসংবাদ পাইয়া আকবরের আনন্দের আর সীমা রহিল না! কি করিবেন চিন্তায় কূল না পাইয়া মন্ত্রণাদাতা আবুল্ ফজল্‌কে দাক্ষিণাত্য হইতে তলব করিলেন এবং রাজকুমার সেলিমের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলেন বলিয়া সংবাদ দিয়া তাঁহাকে নিজ সন্নিধানে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রাজকুমার ড্যানিয়ালের সহিত বিজাপুরের স্থলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের কন্যা জহরা বেগমের বিবাহ দিয়া দাক্ষিণাত্যে শান্তিস্থাপন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; ইহাতেও নানা ব্যাঘাত ঘটে, এবং বিবাহ যদিও হয় তথাপি তাহাকে যথার্থ বিবাহ বলা কঠিন এবং ইহাদ্বারা বাদশাহের উদ্দেশ্যও সাধন হয় নাই।

ইতিমধ্যে আক্‌বর সংবাদ পাইলেন, অতিরিক্ত মদ্য-পানে ভগ্নস্বাস্থ্য ড্যানিয়াল ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। পুত্রগণের মধ্যে ড্যানিয়াল তাঁহার প্রিয়তম; তাঁহার অকালমৃত্যু সম্রাটের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ নরপতি রাজকুমার সেলিমের মুখ দেখিয়া, তাঁহাকে ক্ষমা করতঃ ড্যানিয়ালের শোক-সম্বরণ করিবেন ভাবিতেছেন, কি করিয়া রাজ্যে

শান্তিস্থাপন ও ভবিষ্যৎ সম্রাট্ সেলিমকে শান্ত করিবেন তাহার পরামর্শ লইবার জন্য সচিবপ্রধান আবুল্ ফজলের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল তাঁহার বিশ্বস্ত সচিব, আজীবনের সহচর, প্রিয়তম বন্ধু, পণ্ডিতাগ্রগণ্য আবুল্ ফজল যুবরাজ সেলিমের গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে ইহপৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই বজ্রকঠোর দুঃসংবাদের প্রচণ্ড আঘাত বন্ধু-বৎসল বৃদ্ধ নরপতিকে অন্তিমশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বীরবল ও ফৈজীর মৃত্যুজনিত-শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তদুপরি প্রিয়তম সন্তান ড্যানিয়ালের অকালমৃত্যুর গভীর বেদনা যাহাকে দেখিয়া ভুলিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহারই কৃত কার্য্যে চিরজীবনের সুহৃদ্ সখা মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত অনুচরকে হারাইয়া তিনি কি বেদনা পাইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা পাওয়া কঠিন। যৌবনে সর্ব্ববিষয়ে সুসংযত জীবনযাত্রা, পিতৃসিংহাসন উদ্ধারকল্পে অবিরল সামরিক শ্রম প্রভৃতি কারণে বাদশাহের বলিষ্ঠ বপুঃ বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত দৃঢ় ও কর্ম্মঠ ছিল; কিন্তু উপর্য্যুপরি দারুণ শোকের নিবিড় নিষ্পেষণে এবং সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বংশধরগণের মধ্যে একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার সেলিমের অমানুষিক উচ্ছৃঙ্খলতায় ভগ্নহৃদয় সম্রাটের জীবনসূর্য্য অস্তাচলের উদ্দেশে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সম্রাটকুলতিলক আকবর শাহ যখন দুরারোগ্য ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন রাজা মানসিংহ আকবরের মৃত্যুর পরে সেলিমের পরিবর্ত্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার পরামর্শ করিয়া তাহার উদ্যোগ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। মানসিংহের এই দুশ্চেষ্টা বুঝিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর শাহের অধিক বিলম্ব হয় নাই; এবং পুত্র বর্ত্তমানে পৌত্রের সিংহাসনাধিরোহণ চিরদিনের জন্য উত্তরাধিকার লইয়া বিষম বিবাদের সূত্রপাত করিবে বুঝিয়া, তিনি জীবিত থাকিতেই সর্ব্বসমক্ষে পুত্র সেলিমকে স্বীয় মুকুট নিজহস্তে পরাইয়া, শত সমরের সহায়রূপী নিজ তরবারি তাঁহার হস্তে দিয়া ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যান।

অন্তিম শয্যাশায়ী আক্‌বর শাহ সেলিমের অভিষেক স্বীয় সমক্ষে সম্পন্ন করাইয়া, স্বয়ং তাঁহার নিকট অবনত মস্তকে রাজোচিত অভিবাদন জানাইলেন। রাজা মানসিংহ প্রভৃতি সমস্ত সামন্তরাজগণ ও মুসলমান ওমরাহেরা, স্বয়ং আকবর যাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্মান করিতেছেন, তাঁহাকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিতে মনে মনে অনিচ্ছা থাকিলেও, কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। সেলিমের পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র খস্রু সম্রাট হইলে, সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল হইত কি না সে বিচার এখানে করিবার আবশ্যক

নাই ; কিন্তু প্রথম সূত্রপাতে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়া যথাকালেও খস্রু তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য তৈমুরের প্রতিষ্ঠিত ভারতসিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। আকবর শাহের তাৎকালিক বিচারই খস্রুর পক্ষে অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপিরূপে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য সিংহাসন হইতে সুদূরে রাখিয়াছিল।

আকবর শাহ বাল্যকালেই বাহুবলে শত্রুকরগত পিতৃসাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন ; ন্যায়নিষ্ঠ নবীন সম্রাট্ অভিভাবক বাইরাম খাঁর অত্যাচার-পীড়িত ভারতবাসীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উপদ্রব শান্তির জন্য উপকারী বাইরামকে নির্ব্বাসনদণ্ড পর্য্যন্ত দিতেও কুন্ঠিত হন নাই ; তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে মুসলমান সাম্রাজ্যের পরম শত্রু রাজপুতরাজগণের সহিত নানা প্রকার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমহিতৈষী বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাম্যনীতির পক্ষপাতী হইয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে হিন্দুমুসলমান সকলকেই উপযোগিতার অনুরূপ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরুপদ্রবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মোগলরাজত্ব চিরদিনের জন্য অটুট রাখিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় জাতির অবলম্বনীয় এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মমত ভারতে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজকার্য্য নির্ব্বাহান্তে প্রত্যহ

রজনীযোগে নিভৃতকক্ষে বসিয়া পৃথিবীর নানাদেশীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত জগতের জটিল তত্ত্বনিচয়ের যথাসম্ভব মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না ; সংক্ষেপতঃ, তাঁহার ন্যায় রাজোচিত-সর্ব্ব-গুণসমন্বিত মুসলমান সম্রাট্ ভারত-সিংহাসনে আর উপবেশন করেন নাই।

শুভ্রতুষার-মুকুটমণ্ডিতা, হিমবৎ-নন্দিনী জাহ্নবী-যমুনার পুণ্যসলিলপূতা রত্নাকরধৌতচরণা নির্ঝরঝঙ্কৃতা সামমুখরিতা বিশ্ববাঞ্ছিতা ভারতমাতার কোটি সন্তানের শোকাশ্রুর মধ্যে পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যায় মর্ম্মাহত আদর্শ সম্রাট্ আকবর শাহ চিরদিনের জন্য ইহপৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। জানি না, ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীর আকবর শাহ নশ্বর পার্থিবদেহ ত্যাগ করিয়া কোন্ মহৈশ্বর্য্যময় লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। সংসারে যতদিন ইতিহাসের আদর থাকিবে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের নরনারী আকবরের পুণ্যময়ী স্মৃতি আদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈধব্য

সত্তঃ-অভিষেক-প্রফুল্ল নবভূপতি "জাহাঙ্গীর" উপাধি লইয়া জগদ্বাঞ্ছিত ভারতসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পরলোকগত আকবরের পুণ্যোজ্জ্বল রাজত্বের পরে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জ কি ভাবে দিনযাপন করিতে পারিবে, এই চিন্তায় তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সদাশয় আকবর শাহের সম্পূর্ণ অনুরূপ না হইলেও, পিতার অনেক গুণ জাহাঙ্গীর পাইয়াছিলেন ; কিন্তু চিত্তবৃত্তির দমনোপযোগী সংযম তিনি বাল্যাবধি শিক্ষা না করায়, রিপু-পরবশ হইয়া কখন কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, রাজ্যের জনমণ্ডলী এই ভয়ে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

প্রথম যৌবনসমাগমের সময় হইতেই তিনি সুরাদেবীর অত্যধিক সেবা ও আনুসঙ্গিক লোকবিগর্হিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিবিষয়ে নিরতিশয় স্বেচ্ছাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু দুষ্টের দমন করিয়া ন্যায় বিচারে প্রজার মনস্তুষ্টির চেষ্টা

তাঁহার ছিল। এবং রাজ্যের দীনতম প্রজাও বিচার-প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আবেদন জানাইতে পারে, এই নিমিত্ত তাঁহার নিজকক্ষে একটি ঘণ্টা ঝুলাইয়া তাহার রজ্জুর একপ্রান্ত রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারের সহিত সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিচারপ্রার্থী আসিয়া সেই রজ্জু আকর্ষণ করিলেই বাদশাহের কক্ষস্থিত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, এবং তৎক্ষণাৎ প্রহরী আসিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে লইয়া যাইত। এইরূপে অনেক দীনদুঃখী প্রজাও রাজপুরুষদিগের অন্যায় পীড়ন হইতে রক্ষা পাইত এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ক্ষুদ্র প্রজাকে পীড়ন করা অপরাধে প্রাণদণ্ডে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইয়াছে। অনেক সময়ে এই অপরাধে বাদশাহের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তিও গুরুতর শাস্তিভোগ করিয়াছে এবং এক সময়ে জাহাঙ্গীরের একজন প্রিয়বয়স্য ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের অভিযোগে হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর রাজধানীর সমস্ত লোক বাদশাহের অনুজ্ঞাক্রমে শোকচিহ্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু প্রিয়বন্ধু বলিয়া জাহাঙ্গীর তাহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন নাই। ন্যায়বিচার করিতে বাদশাহ পরাঙ্মুখ হন না দেখিয়া রাজ্যের সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণ অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এবং বাদশাহের মনেও যে সে বিষয়ে

কিঞ্চিৎ গরিমা ছিল, তাহা তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিত পাঠে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। মদ্যপানের সঙ্গী তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গিগণমধ্যে কাহারও মুখে দিবাভাগে যদি সুরাগন্ধ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বাদশাহ তাহাকে প্রকাশ্যভাবে নির্দ্দয়পীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবশতঃ অসৎকার্য্যে তাঁহার অপ্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু লোকসমাজে তাহা গোপন করিবার ইচ্ছাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কারণে, ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন যে কোন পাপানুষ্ঠান করিতেন, তাহা অতি সংগোপনে নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপাত চেষ্টা ছিল। দুষ্ক্রিয়া-শীল রাজার পাপমনোরথ পরিপূরণার্থ দুষ্ট লোকের অভাব কোন কালেই হয় না, জাহাঙ্গীরেরও তাদৃশ লোকের অভাব হয় নাই। সেই সকল লোকের স্কন্ধে তিনি অপরাধের গুরুভার চাপাইয়া স্বয়ং কৃতকর্ম্মের ফলভোগী হইতেন এবং জনসমাজ তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তির বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিল মনে করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

বহুবর্ষব্যাপী প্রাণপাত চেষ্টায় সুবিশাল সাম্রাজ্যে আকবর শাহ যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহার ফলে জাহাঙ্গীর নিরুদ্বেগে ইন্দ্রিয়পরায়ণ

হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। সমগ্র রাজপুতনায়, স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র একমাত্র মেবার দাসত্বের প্রতিকূলে গর্ব্বিতমস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতির স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবমানে, আকবরের রাজত্বকালে, শাহজাদা সেলিম রাজা মানসিংহ ও সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর সহায়তায় হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়গর্ব্বে রাজধানী আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে শিশোদীয় রাজপুতের বাহুবলের যে পরিচয় পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হয়, যে পর্য্যন্ত মেবার সম্পূর্ণরূপে মোগলসম্রাটের আয়ত্তাধীনে না আইসে ততদিন দিল্লীর বাদশাহের বলদর্প ও ক্ষমতার গৌরব বৃথা। সুতরাং মেবার-জয়রূপ একমাত্র রাজকার্য্যে তাঁহার মনঃসংযোগ করিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করিয়াছিলেন; নতুবা যৌবনারম্ভে মেহের-উন্নিসার রূপবহ্নির প্রবলদাহে তাঁহার অন্তঃকরণে যে তুষানল জ্বলিতেছিল, তাহা প্রৌঢ়প্রারম্ভেও কিছুমাত্র উপশমিত হয় নাই। বরং কালে বাল্যের সেই প্রেমাঙ্কুর বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে জাতমূল হইতে লাগিল ও নিরন্তর মেহেরের কামনা তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া উৎপথে



জাহাঙ্গীর বাদশাহ (যৌবনকালে)

লইয়া চলিয়াছিল। আকবরের ন্যায় সাম্রাজ্য জয় করিয়া যদি তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে হইত তবে বোধ করি প্রতিনিয়ত কর্ম্মের জটিল লূতাতন্তুর মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া অবসর অভাবে মেহের-উন্নিসার চিন্তা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইত; কিন্তু নিরুপদ্রুত রাজত্ব হাতে পাইয়া অবসরের তাঁহার অভাব ছিল না; এবং শত্রুহীন সাম্রাজ্য ও সুপ্রশস্ত অবসরই তাঁহার দুরপনেয় চিরকলঙ্ক ও আলীকুলীর নিরপরাধ প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়া উঠিল।

প্রথমে রাজানুগ্রহ দেখাইবার জন্য আলীকে বর্দ্ধমান হইতে আগ্রায় আনা হয়। মৃগয়া উপলক্ষে বলদর্পিত আলীকে ব্যাঘ্রমুখে দিয়া তাহার বল পরীক্ষাচ্ছলে প্রাণে মারিবার ষড়যন্ত্র হয়। বলশালী আলী ব্যাঘ্র বধ করিয়া "শের আফ্‌কন" উপাধি পাইলেন ও সে যাত্রা মৃত্যুর পূর্ব্বস্বাদমাত্র পাইয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যান।

এইবারে রাজাকাঙ্ক্ষিত সুন্দরীর পাণিগ্রহণের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্য আলীর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। সুপ্ত শের আফ্‌কনের অরক্ষিত গৃহে বহুসংখ্যক দস্যু প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় নির্ম্মমভাবে হত্যার চেষ্টা হয়, কিন্তু দস্যুপতির পৌরুষে সে যাত্রাও তিনি কোনমতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তৃতীয়বারে বাঙ্গালার সুবাদার কুতব-উদ্দিন নামক

জাহাঙ্গীরের জনৈক অনুগতব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ্যে মেহেরকে পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব আলীর নিকট করিলে, এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের দুঃসহ অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ শের, কুতবের মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত করিয়া ফেলেন। সেই ছিদ্র অবলম্বন করিয়া সুবাদারের শরীর-রক্ষক সৈন্যগণ বন্দুকের গুলির আঘাতে বীরশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ নিরপরাধ শের আফ্‌কনের বলিষ্ঠ বিপুল দেহ ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল।

হায় রমণীরূপ, তুমিই ধন্য! তোমাকে অবলম্বন করিয়া জগতে কত দুষ্কার্য্যই সাধিত হইয়াছে, কতই নিরপরাধ মহাপ্রাণ পুরুষসিংহের অকালে অন্যায়মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কত জনপদ চিরদিনের জন্য নিঃশেষে ধ্বংসের মুখে গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

ইহসংসারে দুঃসংবাদ বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে চলে; শের আফ্‌কনের অকারণ অকাল মৃত্যুর সংবাদ মেহের-উন্নিসার নিকট পহুঁছিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। সংবাদ পাইয়া শেরগেহিনী নববৈধব্যের অসহ্য বেদনায় "বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী" হইয়া মূর্দ্ধজ বিকীর্ণ করতঃ বিলাপ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে ইতিহাস অপেক্ষাকৃত নীরব। আজ প্রায় তিনশত বৎসর পরে তৎকালের সত্যতথ্য সুনিশ্চিতরূপে কেহ বলিতে পারেন কিনা জানি না। তৎকালের ঐতিহাসিকবৃন্দও নিজ নিজ ব্যক্তিগত

মনোভাবের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মনঃকল্পিত কাহিনীও বহুল পরিমাণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একালে দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগকে সেই কল্পিত ইতিহাসের ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে তথ্য নির্ণয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে হয় তাহারা যথার্থই কৃপাপাত্র।

নারীহৃদয়ের জটিল তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বোধ করি সম্ভবপর নহে; নতুবা প্রাচীন কবি "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" প্রভৃতি উক্তি করিতে ভরসা পাইতেন না। এবং তাহার মধ্যে যে সকল লোকোত্তর রমণী তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা বসুধার পৃষ্ঠ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তিনশত বৎসর পরে আজ তাঁহাদের মনস্তত্ত্বের ভ্রমপ্রমাদশূন্য বিশ্লেষণ একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শের আফ্‌কনের বনিতারূপে বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে মেহের-উন্নিসার বিশেষ কোন কথা লোকসমাজে প্রকাশিত হইবার সুযোগ ও অবসর ঘটে নাই; অনূঢ়া-বস্থায় তাঁহার যে অসামান্য রূপের খ্যাতি আগ্রা রাজ-ধানীতে প্রচার ছিল তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া শেরের সহিত তিনি বর্দ্ধমানে সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন। এই সংসার এক দুই দিবসের নহে। আলীর সহিত বিবাহ মেহেরের আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে হইয়া

থাকিলে, যে সময়ে মেহের বিধবাবস্থায় আগ্রা রাজধানীতে নীত হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৩ বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল শের আফ্‌কনের সহিত পতিপত্নীরূপে একত্র বসবাস করিয়া এবং শেরের ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ, পোষণ ও পালন করিয়া তাহার প্রতি মেহেরের নারীহৃদয়ের স্নেহ প্রেম কিছুই আকর্ষিত হয় নাই, একথা বলিতে অতিবড় সাহসের প্রয়োজন।

প্রথম যৌবনের উন্মুখ সময়ে অনিন্দ্যকান্তি শাহজাদা সেলিমের রূপজ্যোতি ও শাহানশাহ বাদশাহের জগতে অতুলনীয় ধনসম্পদ ও গৌরব গরিমার উজ্জ্বল আলোকে সংসারানভিজ্ঞা কোমলবয়াঃ মেহেরের রাজকুমারের প্রতি আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক বলিয়াছি, যে শেরের সহিত প্রায় বিংশবর্ষ যাপন করিয়া নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গরিমা জননীত্বে মেহের-উন্নিসা উপনীত হইয়াছিলেন তাহার প্রতি মেহেরের হৃদয় একেবারে স্নেহবিমুখ ছিল না, একথাও তেমনই স্বাভাবিক।

সুখসম্পদে সুদিনদুর্দ্দিনে সুদীর্ঘকাল দুইটি প্রাণী একত্র বসবাস করিলে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় না হইয়া পারে না। এরূপ অবস্থায় দুইটি নরনারী —যাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বহুবর্ষ ধরিয়া একত্র জীবনযাপন করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে সেই বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া প্রেমের বন্ধনে পরিণত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

যৌবনারম্ভের রবিরশ্মিপাতে রমণীর অন্তরোল্লসিত হৃদয়পদ্ম তাহার মকরন্দলোভী মুগ্ধ মধুপের প্রথম প্রেম-গুঞ্জনে আকুল হইয়া উঠে সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী-জীবনের যথাসর্ব্বস্ব যাহাকে স্বেচ্ছায় দান করিয়া গৃহিণী ও জননীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সুদীর্ঘ সাহচর্য্যের স্মৃতিকে সহসা সুদূরে সরাইয়া ফেলাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। পক্ষান্তরে, শাহানশাহা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের জগতে দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই। বিপুল পৃথ্বী অন্বেষণ করিলে সুন্দরী নারীর অভাব হয় না, এবং রমণীর চিত্ত আকর্ষণের উপযোগী উপাদান সমূহ ভারতসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রচুর পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল। এরূপ স্থলে যদি মেহের-উন্নিসা জানিতে পারে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শাহজাদা সেলিম একদিন যে মেহেরের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, প্রৌঢ় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের চিত্তকে আজও সেই রূপমোহ নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং তাহাকেই লাভ করিবার জন্য ন্যায়ান্যায়-জ্ঞানবিবর্জ্জিত পৃথ্বিপতির এই বিপুল আয়োজন, তখন তাহার মনে অজ্ঞাতসারেও গোপন পুলকসঞ্চার না হইয়া পারে না। দোষ বলিতে হয় বল, পাপ বল তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু নারী-হৃদয়ের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ইহার বলেই বিশ্বজগৎ তাহার পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত।

শের খাঁর অপমৃত্যুর সংবাদ মেহেরের নিকটে যথাসময়েই পঁহুছিয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যবেদনায় অতিমাত্রায় কাতর হইয়া বহুবিলাপের অবসর তাঁহার ছিল না। পতিবিয়োগজনিত প্রচণ্ডশোকের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহাকে নিরতিশয় চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। বঙ্গের সুবাদার কুতব-উদ্দিন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, শের খাঁ তাঁহাকে হত্যা করে। যদিও কুতবের অনুচরবর্গ শেরের প্রাণবধ করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিল, তথাপি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগলবাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট প্রাণদণ্ডই রাজপুরুষ-হত্যাপরাধের যথেষ্ট দণ্ড বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, বন্দিনীস্বরূপে বিধবা মেহেরকে আগ্রা রাজধানীতে পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রচার হইল।

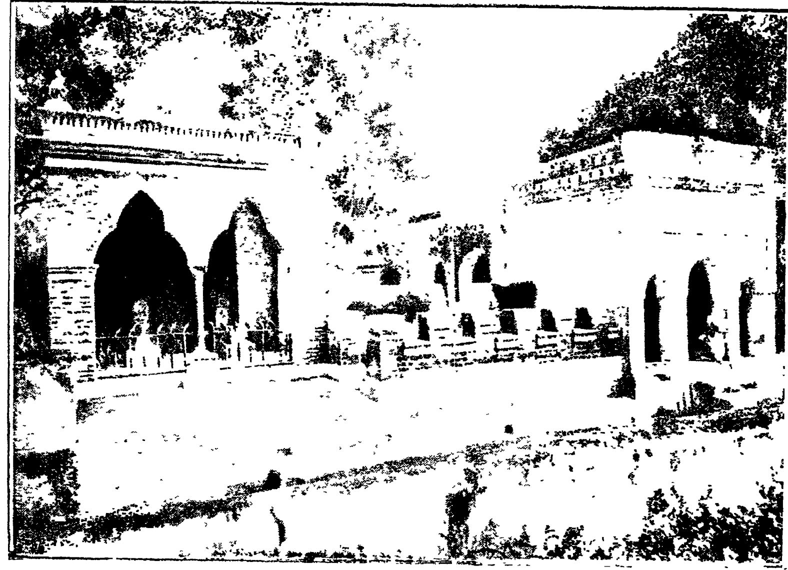
পূর্ব্বাপর-তোয়নিধির তটান্তমিলিত সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় শের ও মেহেরের আড়ম্বরবিহীন নিভৃতজীবনযাত্রার মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী ও অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন সম্রাটের লোলুপদৃষ্টিপাত-উপায়হীন শেরের জীবনান্ত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না দেখিয়া, সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে; কিন্তু যাহার উপলক্ষে এই বিভীষিকার সৃষ্টি, ইতিহাস পাঠে আমরা সেই মেহের-উন্নিসার কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাই না। কেন?

বৈধব্য

দেশকাল-নির্ব্বিচারে জগতে দেখিতে পাই যে, কোন কোন অনন্যসাধারণ নারী আপনার ক্ষমতার উপরে অসীম আস্থা স্থাপন করিয়া আজীবন আপন উন্নতমস্তক ঊর্দ্ধে রাখিয়াই জীবলীলার অবসানে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন ; বর্ত্তমান প্রবন্ধের নায়িকা শের-বনিতা মেহের-উন্নিসা সেই শ্রেণীর রমণীর মধ্যে একতমা। গীয়াসনন্দিনী সৌন্দর্য্যে তাৎকালিক প্রাচ্যরমণীগণের শিরোমণি ছিলেন। একস্থসৌন্দর্য্যদর্শনাভিলাষী বিধাতা যেন সর্ব্বোপমাদ্রব্য যথাপ্রদেশে বিনিবেশিত করিয়া মেহেরের বরবপুঃ সৃজন করিয়াছিলেন। হিমাদ্রির তুষারমণ্ডিত শিখরপ্রদেশে প্রথম ঊষার রবিরশ্মিপাত-জনিত বর্ণলীলা মেহের-উন্নিসার প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত ; রাকানিশীথিনীর সুধাকর-করস্পর্শে দিগন্তবিস্তৃত সুনীল সমুদ্রের ফেনিল ঊর্ম্মি-উচ্ছ্বাস মেহেরের পরিপূর্ণ যৌবনোচ্ছ্বাসের আনন্দহিল্লোলের নিকট পূর্ণপরাজিত। ফলতঃ, শারীরিক সৌন্দর্য্যে মেহের-উন্নিসা তাৎকালিক ভারত-বর্ষের জনমণ্ডলীর একান্তবিস্ময়স্বরূপিণী ছিলেন। তদুপরি গীয়াসবেগ স্বীয় দুহিতাকে তৎকালপ্রচলিত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও কলানৈপুণ্যে পারদর্শিনী করিবার জন্য সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং সে চেষ্টা তাঁহার বৃথা হয় নাই।

যৌবনারম্ভে জাহাঙ্গীর প্রথমদর্শনাবধি মেহের-উন্নিসার

পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন, একথা মেহেরের নারীহৃদয়ের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না। তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার একমাত্র অন্তরায় শের আফ্-কন বাদশাহের ছদ্মচেষ্টায় নিহত হইবার পর কেন মেহেরকে আগ্রায় আহ্বান করা হইল, তাহা বুঝিতে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর বহুবিলম্ব হইবার কথা নহে। সুন্দরী রমণীর পরিপূর্ণ যৌবনে ভোগবাসনার সম্যক্ পরিতৃপ্তি সম্ভবপর নহে, এবং প্রথম যৌবনে যাহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জগৎপ্রথিত ভারতসাম্রাজ্যের একাধিশ্বর শাহানশাহা বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন বাহুবিস্তার করিয়া তাঁহার কামনার ধনকে আকুল আহ্বান করিতেছেন, বিধবাজনোচিত ব্রহ্মচর্য্যের বাহানায় উহা উপেক্ষা করিতে না পারা, অসাধু হইতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।



বৰ্দ্ধমান—শের আফগানের সমাধি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিল্লী-যাত্রা

দিল্লীশ্বরের অনুজ্ঞা ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণের নিকট অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপির ন্যায় দুর্ব্বার ; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বাদশাহের আজ্ঞা যখন মেহেরের মানসিক প্রবৃত্তির অনুকূল, তখন তাঁহার দিল্লী অভিমুখে অভিযানের প্রতিষেধক কিছুই ছিল না।

বর্দ্ধমান হইতে দিল্লী বহুদূরের পথ ; যে দিনের কথা, তখন লৌহ-বর্ত্মের উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া এক দিবসে দিল্লী পৌঁছিতে পারিত না। বাদশাহের প্রেরিত সুদক্ষ রক্ষিপরিবৃত তাম্‌ঝাম মেহেরকে লইয়া ধীরে ধীরে কুচ্‌ করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সুদীর্ঘ-কালেই রাজধানীতে পঁহুছিয়া থাকিবে। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী পঁহুছিতে যে সময় লাগিয়াছে, সেই সময় মধ্যে মেহেরের হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে যে সকল চিন্তা উদিত হইয়াছে তাহার যথাযথ বিশ্লেষণ সুদক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণের পক্ষে উহা নিরতিশয় দুরধিগম্য।

নবোঢ়া কিশোরী দ্বিরাগমনের দিনে স্বামী-সান্নিধ্যের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া সলজ্জ পাদ-

বিক্ষেপে যে ভাবে শ্বশুরালয়ে আগমন করে, মেহেরের দিল্লী আগমন তাহার সহিত তুলনীয় নহে। শুদ্ধান্তসম্ভোগ-পরিতুষ্ট প্রৌঢ় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর শের আফ্‌কনের পরিণতবয়াঃ বিধবা পত্নীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, কি পদবী দান করিয়া কোন্ স্থান অধিকার করিতে রাজাধিরাজ তাঁহাকে রাজান্তঃ-পুরে ডাকাইয়াছেন, ভারতসম্রাটের অর্দ্ধাঙ্গিনী বা অবসর-সঙ্গিনী হইয়া তাঁহাকে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে—ইত্যাদি নানা চিন্তা তাঁহাকে অতিমাত্রায় আকুলিত করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মেহের-উন্নিসার ন্যায় অনবদ্যসুন্দরী, তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী রমণী কেবল মাত্র বাদশাহের সম্ভোগ-সামগ্রীরূপে রংমহলে দিনাতিপাত করিতে পারে না, এই সহজ সত্য মেহেরের নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল না। কিন্তু ভারতভাগ্যবিধাতা, অসংখ্য সুন্দরী-পরিসেবিত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের তাদৃশী ইচ্ছার গতিরোধার্থ তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তি কি ভাবে নিয়োজিত হইতে পারে, এই দুরূহ সমস্যার কোনরূপ মীমাংসা দিল্লীর পথে মেহের করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানিতেন, ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে এ বিষয়ে কিছুই নির্দ্দেশ করে নাই।

দিল্লী পঁহুছিয়া এক নূতন সমস্যা তাঁহার

সম্মুখে উপস্থিত হইল। মেহের-উন্নিসা যখন দিল্লীর রংমহলের তোরণদ্বারে উপস্থিত, তখন বাদশাহ অকস্মাৎ আদেশ দিলেন—"শের-বিধবাকে জননী-বেগমের মহলে পাঠান হউক, বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই; সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারণে তাঁহাকে জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা গেল।"

যাহাকে লাভ করিবার জন্য জগৎপতি জাহাঙ্গীর প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন নানারূপ কুৎসিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; যাহার জন্য ধর্ম্ম, লোকাপবাদ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; সুদীর্ঘ বহুবৎসর ধরিয়া যাহার রূপের অনুধ্যানে বাদশাহ মোহাবিষ্টের ন্যায় বিচার-শূন্য হইয়া অবিরত উৎপথেই চলিয়াছিলেন—সেই বাঞ্ছিত ফল যখন করতলগত, তখন নিমেষমধ্যে তাহাকে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান মেহেরকে কথঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে, এই প্রত্যাখ্যানকে যথার্থ সত্য বলিয়া মেহেরের অন্তরাত্মা গ্রহণ করিতে চাহিল না—তাঁহার ধ্রুব ধারণা জন্মিল, ইহা কারণাধীন অবশ্য-আচরণীয় রাজকীয় কূটনীতি মাত্র। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া সাম্রাজ্যের ছোট বড় সকলেরই অল্প বিস্তর এই ধারণা হইয়াছিল যে, পাপে বা দুষ্কার্য্যে বাদশাহের অপ্রবৃত্তি না থাকিলেও, জনসাধারণের মনোবৃত্তির উপর নির্ম্মম পদাঘাত করিয়া

প্রকাশ্যে পাপানুষ্ঠান করিবার মত দুর্ম্মতি এবং দুঃসাহস তাঁহার ছিল না। নিন্দনীয় দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইলেও তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে কোন এক প্রকার আবরণ উপস্থিত কারিয়া স্বীয় কার্য্য-সমর্থন-চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেন।

বিনাপরাধে বা কাল্পনিক অপরাধের ছল করিয়া স্বামীকে হত্যা করতঃ নির্লজ্জ বর্ব্বরের ন্যায় সদ্যো-বিধবাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিতে সম্রাট্ সঙ্কোচ বোধ করায় কালহরণের এই সুপন্থা বাহির করিয়াছেন, ইহা মেহেরের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধি-মতী রমণী এই বিলম্বে ক্ষুব্ধ হন নাই, বরং রংমহলে থাকিয়া বাদশাহের মন পরীক্ষা করিবার সুযোগ ও সময় হইবে জানিয়া, অন্তরে অন্তরে আনন্দই অনুভব করিয়া থাকিবেন। বাদশাহ যখন জনসমাজে নিন্দনীয় হইবার আশঙ্কায় চিরপ্রার্থিত রমণীকে স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াও নিজের দুর্নিবার প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া কালহরণ করা শ্লাঘ্য মনে করিতে পারিলেন, তখন মেহের-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও গর্ব্বিতা রমণীর পক্ষে, 'পতিহন্তার মুখদর্শন করিব না' বলিয়া চিত্তসংযমের পরিচয় দেওয়া কোন প্রকারেই আশ্চর্য্যজনক ও অস্বাভাবিক নহে।

জাহাঙ্গীরের প্রতি মেহেরের আন্তরিক অনুরাগ

ছিল, নতুবা সদ্যোবিধবা মেহের-উন্নিসাকে দিল্লী অবরোধের মধ্যে জীবন্ত লইয়া আসা বাদশাহের সাধ্যাতীত হইত। উপরন্তু, ভারতসিংহাসনের আকর্ষণ মেহেরের চিত্তকে প্রলুব্ধ করে নাই, একথা সাহস করিয়া কোন ঐতিহাসিক বলিতে পারেন নাই। সম্রাট্ এবং সাম্রাজ্য এতদুভয়ই লাভ করিবার আশায় মেহের বৰ্দ্ধমান হইতে দিল্লী আসিয়াছিলেন; এবং বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই জানিয়াই তিনি সতী বিধবার চরিত্রবল দেখাইয়া দশের নিকট যশোলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাদশাহের আদেশানুসারে মেহের-উন্নিসা জননী-বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন বটে, কিন্তু রাজকোষ হইতে যে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই। কুমারী অবস্থায় যে সূচীশিল্প ও চিত্রবিদ্যা তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন, দিল্লীর চাঁদনি-চকে তাহাই বিক্রয় করাইয়া তল্লব্ধ অর্থে কোন প্রকারে দিনপাত করিতেন।

এই ভাবে প্রায় চারিবৎসর কাল অতিবাহিত হইল। এই সুদীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া মেহের-উন্নিসা ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্টঃ অবস্থায় কিরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস বলে না, চেষ্টা করিলে বলিতে পারিতও না। তাদৃশাবস্থা-পন্না কোন নারী-ঐতিহাসিক যদি ইতিহাস লিখিতে

বসিতেন, তবে কি হইত বলা যায় না, এবং মেহেরের স্বরচিত কোন ইতিহাস বা রোজনামচার সন্ধান পাইলে একালের লেখকেরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতেন। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী আছে, জেব-উন্নিসার "রুবাইয়াত" পাওয়া যায়, কিন্তু জাহাঙ্গীরের জীবিত-রূপিণী, প্রাচ্যরমণীগণের শিরোমণি, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি গ্লানিকর কথাই শুনিয়া আসি-তেছি ; তাহাও আবার শতাব্দী পরের বিজাতীয় ভাষায় লিখিত বিদেশীয় ভ্রমণকারীর রোজনাম্চার নকল। "কালো হি বলবত্তরঃ"—কথা মিথ্যা নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আশা ফলবতী

সুখে হউক দুঃখে হউক, দিন একরূপে কাটিয়া যায়। সময় কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। রাজাধিরাজ জাহাঙ্গীরের রাজকার্য্যে, আনন্দোৎসবে, শিকারে, ব্যসনে দিন একরূপে কাটিয়া গিয়াছে এবং রাজাবরোধের একপ্রকার রাজ্ঞীসেবা-নিরতা বিধবা মেহের-উন্নিসার আশা-নিরাশায়, দুঃখে-দৈন্যে, রোগে-শোকে কি ভাবে সময় কাটিয়া গিয়াছে তাহা রংমহলের অধিবাসিবর্গের চক্ষু এড়াইয়া থাকিলেও, জগৎপতির জাগ্রত দৃষ্টির সীমার বাহিরে পড়ে নাই। অমানিশার অবসানে রাকানিশীথিনী যাঁহার সৃষ্টি, কুহূরজনীর অন্তে নির্ম্মল ঊষা যাঁহার প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তের দান, নিদারুণ হিমঋতুর অবসানে প্রফুল্ল বসন্ত যাঁহার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনে, সেই সর্ব্বকার্য্যকারণের নিয়ন্তা বিশ্ববিধাতা মেহেরের দারুণ দুঃখের প্রতি বাদশাহের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিলেন।

রমজানের রোজা রক্ষা করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় যে দিন নববধূর ললাটস্থ চন্দনলেখার ন্যায় সন্ধ্যাসুন্দরীর মেঘমুক্ত ললাটে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্রলেখা

দেখিতে পায়, সে দিন তাহাদের ঈদ্ মহোৎসবের মহা-সমারোহময় পরমানন্দের দিন। সে দিন মুসলমান নর-নারী নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও অশন বসনের আয়োজন করে। এ হেন আনন্দময় পর্ব্বদিনে দিল্লী রাজপ্রাসাদের রংমহলে সীমাহীন আনন্দ-সাগরের লহরলীলা যাহার চক্ষুগোচর হয় নাই, উন্মাদ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াও সে আনন্দের সহস্রাংশের একাংশও অনুভব করিবার প্রয়াস তাহার পক্ষে নিতান্তই নিস্ফলপ্রয়াস।

রংমহলের অধিবাসিনীগণ যখন বাধাবিহীন আনন্দ-স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, শাহান্‌শাহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের মন তখন কি জানি কেন বিধবা মেহের-উন্নিসার জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বাদশাহ জানিতেন, রূপে গুণে মেহের হিন্দুস্থানের রমণীবৃন্দের মুকুটমণি, ভাগ্য-দোষে আজ সে সর্ব্বস্বসুখবঞ্চিতা বিধবা; সে বৈধব্যেরও হেতু বাদশাহের অন্তরাত্মার নিকট অপ্রকাশিত ছিল না। যে রত্ন রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটে স্থান পাইবার যোগ্য, তাহাকে নানা চেষ্টায় আহরণ করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার পরে অযত্নে মলিন হইবার জন্য রাজাবরোধের উপান্ত-ভাগে অবহেলায় নিক্ষেপ তিনিই করিয়াছিলেন, তাই বোধ করি আজ চির-উপেক্ষিতার জন্য রাজাধিরাজের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠিল। যাহার জন্য অন্তর

পীড়িত হইয়া উঠে, বিগত কালের দুর্ব্ব্যবহারের ক্ষতি-পূরণ করিতে মানবহৃদয় সেখানে কৃপণতা করে না ; তাই বোধ করি মেহেরের শুভাদৃষ্টরূপী ভারতভাগ্যবিধাতা জাহাঙ্গীর আজ দয়া-বিনম্র-হৃদয়ে, বিগত কার্পণ্যের প্রায়শ্চিত্তমানসে, প্রসন্নমনে, উপেক্ষিতা বিধবার মলিন বাসভবনের অভিমুখে অবিচলিত পাদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। সুদীর্ঘ বহুবৎসরের পরে বাদশাহ আজ জানিতে পারিয়াছেন যে মেহের-উন্নিসা তাঁহার হৃদয়ের কত নিকটবর্ত্তী এবং অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট মেহের কত প্রয়োজনীয়।

বিধবার শোকমলিন মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বাদশাহ যাহা দেখিলেন, তাহাতে করুণায় তাঁহার হৃদয় অধিকতর আর্দ্র হইয়া উঠিল। যে অল্পসংখ্যক দাসদাসী মেহেরের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা সকলেই ঈদ্ উপলক্ষে মহার্ঘ বসনভূষণে ভূষিত হইয়াছে, কেবল ব্রহ্মচর্য্যনিরতা বিধবা মেহের-উন্নিসা যথার্থই ব্রহ্মচারিণীর জীর্ণচীরে লজ্জা নিবারণ করিয়া স্বীয় জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ চিত্র ও সূচীশিল্পে নিযুক্তা রহিয়াছেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সকলধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যেই প্রশংনীয়, ইহাতে বিশেষ করিয়া বেদনাবোধ করিবার কিছুই নাই, কিন্তু মেহেরের বৈধব্যব্রত সে শ্রেণীর নহে। বাদশাহ জানিতেন, শের আফকন্ প্রাপ্তকালে জীবনের

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যুর অপরিজ্ঞাত অন্ধকারময় পথে যাত্রা করে নাই; মেহেরের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ আলীকুলীর দস্যুহস্তে অপমৃত্যু তাঁহারই প্রচ্ছন্ন-চেষ্টায় ঘটিয়াছিল। সেই লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাজাবরোধে নীত হইয়া রঙ্গমহলের নিভৃত প্রান্তে অখ্যাতজীবন অজ্ঞাতে কাটাইবার নিমিত্ত বিধবা দারুণ উপেক্ষায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এবম্বিধ সমস্ত ঘটনা একে একে বাদশাহের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তদুপরি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেহের-উন্নিসার অদ্ভুত লাবণ্যরাশি জীবন-মধ্যাহ্নে অবজ্ঞার ফলে বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় অকালে শুষ্ক হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ভারতেশ্বরের চক্ষুও শুষ্ক ছিল কিনা কে বলিবে ?

স্বীয় দীনতাপূর্ণ প্রকোষ্ঠে রাজ্যেশ্বরের শুভাগমন হইয়াছে দেখিয়া মেহের-উন্নিসা সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিলেন। ভূমিস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন এবং করযোড়ে আজ্ঞার অপেক্ষায় রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে আনত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাদশাহ, প্রচলিত প্রথানুযায়ী কুশলপ্রশ্ন করিবার পর, দাসদাসীর মহার্ঘ সাজসজ্জা ও তাঁহার দীন বেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আনতনয়নে মেহের উত্তর করিল, "আমার দাসদাসীকে আমার ইচ্ছানুসারে বসনভূষণে

সজ্জিতা করিয়াছি ; কিন্তু আমি যাঁহার দাসী, তিনি যে ভাবে আমায় রাখিয়াছেন তদবস্থাতেই সুখী হওয়া আমার একান্ত অবশ্যকর্ত্তব্য। জাঁহাপনার ইঙ্গিতই আদেশ স্বরূপ শিরোধার্য্য করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।”

সুদীর্ঘ চারিবৎসরের হতাদর ও উপেক্ষার পরে সুন্দরী যুবতীর এরূপ বিনয়নম্র মধুর উত্তরে পুরুষের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভুক্তভোগী ছাড়া একথার সদুত্তর অপরের করা সম্ভব কিনা জানিনা। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি, যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ জীবন্ত মনুষ্যের সমগ্র শরীরের চর্ম্ম খুলিয়া লইবার আদেশ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই, সামান্য অপরাধের জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর হস্তিপদতলে ভয়াবহ জীবন বিসর্জ্জনের বীভৎস দৃশ্য দেখিতে যাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই, তিনি এই নিঃসহায়া সুন্দরী বিধবার দ্বিধাহীন মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন নাই। বাদশাহ হইলেও জাহাঙ্গীর মানুষ, মানুষের মতই এক সময়ে মেহের-উন্নিসার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় এক সময়ে এই যুবতীকে লাভ করিবার জন্য হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া অসদনুষ্ঠানের চরম করিয়াছিলেন এবং বুঝি বা প্রেমজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কায় প্রলোভনের সামগ্রী মেহের-

উন্নিসাকে জননীর রক্ষণাবেক্ষণের অধীন করিয়া কিছু-দিনের জন্য নিজকে নিরাপদে রাখিয়াছিলেন।

চারিবৎসর ধরিয়া হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে যে কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য প্রস্তর-প্রাকার রচনা করিতেছিলেন, আজ নিমেষ মধ্যে রমণীর নতনেত্রপাত ও করুণবচন তাহা কোথায় ভাসাইয়া লইল বুঝিতেও পারিলেন না; রাজমর্য্যাদা, কূটনীতি, লোকাপবাদ প্রভৃতি সমস্ত চিন্তাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া, মেহেরকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দান করতঃ তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুদীর্ঘ চারি বৎসরের তপশ্চর্য্যার পর ইষ্ট দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া অভীষ্ট বরলাভে মেহেরও কৃতার্থ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজপরিণয়

জাহাঙ্গীর বাদশাহ মেহেরকে যখন বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান, তখন মেহেরের চিন্তাস্রোত কোন্ দিকে চলিয়াছিল বলা সহজ নহে। বৈধব্যের পরে দিল্লী অবরোধে আসিতে আসিতে বাদশাহের মন পরীক্ষার জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং বাদশাহ যখন প্রত্যাখ্যানের ভাণ করিয়া মেহেরকে জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন তখন সেই পরীক্ষার অবকাশ পাওয়া গেল ভাবিয়া মেহেরের ন্যায় দর্পিতা রমণী নিজকে অপমানিত বোধ করেন নাই, বরং তাঁহার মনোভাবের অনুকূল সুযোগ ভাবিয়া মনে মনে সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন, একথাও বলিয়াছি। আপাতদর্শনে যাহাকে সুদীর্ঘ চারি বৎসরের অবজ্ঞা বলিয়া মনে হইতে পারে, সেই অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যে মেহের-উন্নিসার নারীহৃদয় তাঁহার প্রতি বাদশাহের মনোভাবের কি নিদর্শন পাইয়াছিলেন বলিতে পারি না এবং কোন ঐতিহাসিকই সে কথা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই চারি বৎসর কালের মধ্যে রংমহল-নিবাসিনী

মেহেরের সহিত বাদশাহের কোন সময়েই দেখা হয় নাই, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। দেখা কখনও হইয়াই থাকিবে; সে দেখা ক্ষণিকের হইতে পারে, সহস্র লোকচক্ষুর সাক্ষাতে মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চারি চক্ষুর সম্মিলন হওয়া বিচিত্র নহে, বরং বিশেষ সম্ভব। এই ক্ষণিক দর্শনেই হয়তো মেহের যাহা জানিবার জন্য রং-মহলে দাসীবৃত্তি করিয়া বাস করিবার সুযোগও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, যাহা জানিবার জন্য তাঁহার দর্পিত নারীহৃদয় কোন অপমানকেই অপমানবোধ ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই, তাহার কিছু না কিছু আভাস পাইয়াই থাকিবেন; নচেৎ সুদীর্ঘ চারি বৎসরের অনিশ্চিত আশা নিরাশার মধ্যে মেহেরের নারীহৃদয় ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িত।

যে রাজচক্রবর্ত্তীকে আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইত, তিনি তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী মেহেরের কোন খবরই রাখিতেন না একথা সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এই মেহের-উন্নিসা দিল্লীর রাজ-প্রাসাদে স্বেচ্ছায় বন্দিনী হইয়া আসেন নাই। তাঁহার নব-বৈধব্যের অসহ্য বেদনার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া রাজাদেশেই তাঁহার অনুচরবর্গ মেহেরকে রাজ-অবরোধের মধ্যে পহুঁছাইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রাজকীয় কূটনীতির খাতিরে বাদশাহ তাঁহার সহিত

তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হইয়া সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও এই সুন্দরী বিধবার দর্শন-লালসা দিল্লীশ্বরকে চারি বৎসরের মধ্যে কখনই কাতর করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া যিনি বলিতে পারেন বলুন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক অপারগ। আমার বিশ্বাস, প্রকাশ্যে বাদশাহ যতই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করুন, এই চারি বৎসরকাল মধ্যে সময়ে সময়ে ছল ছুতা নানা উপলক্ষ করিয়া তিনি মেহেরের দর্শনপথে আসিয়া পড়িতেন এবং সেই ক্ষণিক দর্শনের মধ্যে নয়নের তারহীনতড়িৎ কি বার্ত্তা প্রকাশ করিত, তাহা এই অযোগ্য লেখকের বর্ণন-ক্ষমতার অতীত।

মুসলমান সম্রাট্‌দিগের বিবাহ-সমারোহের বর্ণনা কোন ইতিহাসে পড়িয়াছি কি না মনে নাই। সেকালের ঐতিহাসিকগণ কেবল বিবাহের সংবাদটা দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতেন এবং সম্রাট্‌দিগের বিবাহের পৌনঃপুন্যে সমারোহের বর্ণনা বৈচিত্র্যবিহীন হইবার ভয়ও বোধ করি তাঁহাদের ছিল। তাই বর্ণন-বাহুল্যে সে সকল বিবাহ ভারাক্রান্ত হইতে পারে নাই। মেহের ও জাহাঙ্গীরের বিবাহের কোন বর্ণনা কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না; তবে নাটকে আমোদের অঙ্ক অভিনয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া একটা প্রকাণ্ড হর্ষামোদের

ছবি আঁকিতে সাহস হইতেছে না। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহে বিশেষ কিছু ধুমধাম না হইয়াই থাকিবে। আড়ম্বর-বাহুল্যের দ্বারা এই চিরায়মান ও বিলম্বিত বিবাহের স্বল্পাবশিষ্ট মাধুর্য্যকে অভিভূত করিবার ইচ্ছা বোধ করি কোন পক্ষেরই ছিল না, তাই এ বিবাহ হয়ত নীরবেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছিল।

মোগল সম্রাটের বেগমরূপে দিল্লী রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্থান পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে নারী-সৌভাগ্যের চরম বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখের নিদান কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সপত্নী-বহুল দিল্লীর রংমহলে সকল বেগমেরাই যে পতিপ্রেমের প্রগাঢ়-বেষ্টনের মধ্যে নিষ্কণ্টকে আজীবন সুখে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, একথা কেহই বলিতে পারে না। সপত্নী-বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই নারীজীবনের বিষম কণ্টকস্বরূপ; তাহার মধ্যে প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই এই বিদ্বেষের ফলে কত অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মেহের-উন্নিসা জানিতেন, তিনি তাৎকালিক প্রাচ্য রমণীগণের মধ্যে রূপমাধুর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; আরও জানিতেন যে শাহান্‌শাহ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কিশোর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পরিণত প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত মেহেরের রূপে সমভাবে মুগ্ধ; কর্ম্মসঙ্কুল সম্রাট-জীবনের

ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে একদিনের জন্যও জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয় মেহেরকে ভুলিতে পারেন নাই ; রংমহলের নৃত্য-গীত ও সুরাস্রোতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিবার সময়েই হউক, অথবা সমরাঙ্গনে শিরশ্ছেদোদ্যত শত্রুর শাণিত খড়্গের ভীষণ দীপ্তি যখন স্বীয় কবন্ধের বীভৎস মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছে, তখনই হউক, কোন সময়েই এক মুহূর্ত্তের জন্যও মেহের-উন্নিসার অনিন্দ্যসুন্দর নয়নাভিরাম কমকান্তি জাহাঙ্গীরের মানস-নয়নের অন্তরালে যাইতে পারে নাই, একথা মেহের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিলেও রাজা-বরোধের সপত্নীবিদ্বেষ তাঁহাকে আতঙ্কিত করে নাই, একথা বলা যায় না। সেই সময়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা যাহা দেখি তাহাতে মনে হয়, বিবাহের অব্যবহিত কাল পরেই যদিও মেহেরের মনে সপত্নী-ভীতি তাদৃশ প্রবল হয় নাই, কিন্তু যথাকালে ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁহার ছিল এবং প্রথমাবধিই তিনি সেই ভাবী উৎপাতের মূলোচ্ছেদ করিবার যত্ন ধীরে ধীরে করিতেছিলেন। ইহা নারী-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ গতি।

শিক্ষা, সৌজন্য, পরদুঃখকাতরতা ইত্যাদি যে গুণেই নারীহৃদয়ের সৌন্দর্য্যবিধানের চেষ্টা করা হউক না কেন, সপত্নীর সুখ-সৌভাগ্যে কুপিত হয় না এমন নারী কেহ

কোন দিন দেখিয়াছেন কিনা জানি না ; সম্ভব—নহে। ভট্টি-কাব্যের "ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমং" এই আলঙ্কারিক দোষশূন্য শ্লোকপাদ বৃথা লিখিত হইয়াছিল বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি জানি না। নিতান্ত নির্ধনের গৃহেও যদি কোন অনিবার্য্য কারণে একাধিক পত্নীর সমাবেশ হয়, তবে সামান্য হেতুকে উপলক্ষ করিয়া দ্বন্দ্ব, কলহ, মনোমালিন্যের শেষ থাকে না। রাজাধিরাজের গৃহে, যেখানে যথার্থ ক্ষমতা পরিচালনের উৎকট আনন্দের অপেক্ষায় মানব-মন ব্যগ্রতার চরম সীমায় আসিয়া বীভৎস হিংস্র-মূর্ত্তি ধারণ করে, সেখানে বহু বেগমের একত্র বসবাস অবিমিশ্র সুখসম্বর্দ্ধক হইতে পারে না একথা সামান্য বুদ্ধিরও অনধিগম্য নহে।

মেহের-উন্নিসা যে পারসীকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা ইতিহাস পাঠে সেই বংশের তিনপুরুষের সংবাদ অবগত আছি। মির্‌জা গীয়াসবেগের পিতা পারস্যের অন্তর্গত এক খণ্ডরাজ্যের প্রধান সচিবের কার্য্য আজীবন যশের সহিত নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন। মেহেরের পিতা মির্‌জা গীয়াসবেগ স্বদেশবাসীর হস্তে নিরতিশয় নিগ্রহ সহ্য করিয়া, ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ভারতবর্ষ অভিমুখে সস্ত্রীক আগমনকালে দুঃসহ পথকষ্ট যেরূপ ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসীম মানসিক বলের পরিচয় আমরা পাইয়াছি ; এবং অল্প-

কালমধ্যে বান্ধববিহীন বিদেশে আকবর শাহের রাজ্যে যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তাও বিশিষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। গীয়াসের পুত্র আসফ খাঁ পিতার জীবিতকালেই মোগল সম্রাটের প্রধান কোষা-ধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া যে কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রীপদ পাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বিষম বিপদসঙ্কুল শার্দ্দূলাদি হিংস্রজন্তু-পরিসেবিত নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে প্রয়াণ-সময়ে আসন্নপ্রসবা গীয়াসপত্নী স্বামীর অনুগমন করিয়া যে হৃদয়বলের পরিচয় দিয়া-ছিলেন, বাগ্‌দত্তা কন্যাকে ভারতের ভাবী সম্রাট্ শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার যে গর্ব্ব ও তেজস্বিতার আভাস দিয়া-ছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। পিতা পিতামহ ভ্রাতা মাতার এই সকল সদ্‌গুণরাজি মেহের-উন্নিসা যে সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা মেহেরের ইতিহাসবর্ণিত কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনায় জানিতে পারি। ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিচালনা করিবার ইচ্ছা মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং পুরুষপরম্পরা সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়া কর্ত্তৃত্বের মদিরস্বাদ যাঁহারা যথেষ্ট

পরিমাণে পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশোদ্ভবা অপূর্ব্ব সুন্দরী সুশিক্ষিতা এবং কলানিপুণা মেহের-উন্নিসা প্রাসাদান্তঃপুরে নিঃসপত্নী হইয়া পতিপ্রেমের একমাত্র অধিকারিণী হইবার প্রয়াস পাইবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অনন্যোপায় হইয়া রাজগৃহে আনীত হইলে এবং অগত্যা সম্রাট্‌কে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলে, হয়ত স্বামীর প্রেমবেষ্টনকে নিষ্কণ্টক করিতে মেহের তাদৃশ চেষ্টা না করিতেও পারিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজাবরোধকে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন করিবার বিহিত চেষ্টা দেখিয়া নিঃসন্দেহ মনে হয়, রাজাধিরাজ জাহাঙ্গীর এই প্রৌঢ়া সুন্দরী মেহের-উন্নিসার হৃদয়স্থ কোমলতম স্থানে অটলভাবে অবস্থিত ছিলেন এবং সেই জন্যই জাহাঙ্গীরের যাবতীয় অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া নারীহৃদয়ের প্রেম-মন্দাকিনীর বিমল ধারায় অভিষিক্ত করতঃ মেহের-উন্নিসা তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও অতি দূরেই ছিলেন; অমৃত-সাগরের কূলে বসিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তাহার উপর আবার দাসীবৃত্তির দুঃসহ অপমানভার তাঁহার স্কন্ধে জাহাঙ্গীর কেন চাপাইয়া দিলেন তাহার সুনিশ্চিত

কারণ জানিবার কোন সুবিধা ঘটে নাই; অনুমান করিয়া নিজের মনে মনে যতটুকু বুঝা যায়, মেহেরের কেবল একমাত্র উহাই সম্বল। এরূপ ক্ষেত্রে হতাশ্বাসের শেষ মুহূর্ত্তে এবং প্রায়োত্তীর্ণ লগ্নে যখন বিবাহব্যাপারটা নিষ্পন্ন হইয়া গেল, তখন যদি মেহের-উন্নিসা ভবিষ্যৎ বিষপ্রয়োগের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া জাহাঙ্গীরকে নিবিড়-তর প্রেমবেষ্টনের মধ্যে ঘেরিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন এবং সম্ভাবিত সপত্নীদিগের সুদূরে সরাইবার কোন প্রয়াস পান তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসপক্ষে মেহেরের কি কি সঙ্গত কারণ ছিল, তাহা একবার বিশেষ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী মেহের-উন্নিসা যখন মাতার সহিত রংমহলে যাইতেন, রাজকুমার সেলিমের ভুবনৈকসুন্দর বরবপুর সমাসন্ন যৌবনশ্রী তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছিল, একথা আমরা জানি। রাজকুমারের নয়নও অন্ধ ছিল না; মেহেরের অনন্যসাধারণ অনবদ্য সৌন্দর্য্য সুন্দরীবহুল রাজাবরোধেও দুর্ল্ভ একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরকে পলকহীন বিস্ফারিত নেত্রে বহুক্ষণ চাহিয়া দেখিতে হয় নাই। কিন্তু হায়, কন্দর্প দেবতা যখন প্রথম দর্শনাবধি এই দুইটি নরনারীর পেলব-হৃদয় পুষ্প-শায়কের তীক্ষ্ণাগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া একত্র করিতে ব্যস্ত

ছিলেন, তখন বৃদ্ধ বহুদর্শী ও বিজ্ঞ পিতা আকবর শাহ ভাবী মঙ্গল মানসে এই কিশোর-মিথুনের মধ্যে গিরি-দরী-নগরীর শত ব্যবধান সৃষ্টি করিবার জন্য বিশেষ-ভাবে ব্যগ্র। সচিবশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আবুল ফজল এবং কবি-রাজ ফৈজী প্রভৃতি বিজ্ঞের দলও বিধি-বিধানের সহিত বিবাদ করিয়া একের ধন অন্যের হস্তে সমর্পণ করতঃ নিশ্চিন্ত হইবেন ভাবিয়াছিলেন।

যোজনব্যবধানের অনুপাতে যদি হৃদয়ের ব্যবধান ঘটাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী সুখের কি দুঃখের হইত বলা কঠিন। বিধির বিধানে যাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা বাতুলতার পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। উজ্জ্বল রাজমুকুটের মহার্ঘ-রত্ন আলিকুলীর দীনতাময় শিরস্ত্রাণে গুঁজিয়া দিয়া তাহার সমস্ত জীবনকে সঙ্কটপূর্ণ করা ব্যতীত আর কোন ফলই হয় নাই, বরং প্রেমাকৃষ্ট যুগল-হৃদয়ের উদ্দাম গতিমুখে প্রবল বাধা সৃজন করিয়া উপলরুদ্ধ নদীস্রোতের মত তাহার প্রবল বেগকে ক্রমশঃ পরাক্রান্ত করিয়াই তোলা হইয়াছিল। ভারতসম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারীকে স্নেহ-সরস স্ফুটনোন্মুখ হৃদয় দান করিয়া, আলির সহিত শূন্য সংসার পাতিয়া বসা মেহেরের জীবনকে কি নিদারুণ-ভাবে অভিশপ্ত করিয়াছিল তাহা মেহেরই জানিত। পরিপূর্ণ

হৃদয়ের অতলস্পর্শ গভীর প্রেম দান ও গ্রহণ করিবার জন্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে একান্ত উদ্যত ; কিন্তু হায়, মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা সৃজন করতঃ তাহাদিগকে চির-বিরহ-কাতর করিয়া কাহার কি ফল হইয়াছে কে জানে ?

প্রেমাতুর নরনারীকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের বুভুক্ষিত আকাঙ্ক্ষাকে চির-তৃষাতুর করিয়া রাখা হইয়াছিল ; এবং জীবনের অপরাহ্নে বিগতপ্রায় বাসরে স্বল্পাবশিষ্ট সময়টুকু যখন একত্র বসবাসের সুযোগ লইয়া উপস্থিত হইল, তখন বিগত জীবনের ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের চতুর্দ্দিকে তাঁহার অক্ষুণ্ণ রূপযৌবন ও অনির্ভিন্ন গভীর প্রেমের সতর্ক প্রহরী বসাইয়া দিলেন ; এবং জাঁহাপনাও দেবদুর্লভ রূপতরঙ্গ ও অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আত্ম-নির্ব্বাণের অনির্ব্বচনীয় সুখের সন্ধানে সমুৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহিণীপদে

মোগল বাদশাহদিগের মধ্যে প্রথা ছিল, একজন করিয়া রাজপুত নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এরূপ রাজনৈতিক বিবাহে সহস্র প্রকারের শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু তৎকালে এই বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনৈক্য থাকায়, আর যে ফলই হউক, দম্পতীর মধ্যে প্রেমসম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠিবার অবসর পাইত না। রাজপুত রাজকুমারী রাজরাজেশ্বরী হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রিয়-হৃদয়ের একাধিপত্য—যাহা নারী-জীবনের মহামূল্য সম্পদ—তাহা হইতে এই রাজ্ঞী-সম্প্রদায়কে চিরবঞ্চিত থাকিতে হইত।

কন্দর্পদেবতা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তাঁহার চিরকৌতুকপ্রিয় স্বভাবের গুণে তিনি নিখিলের নরনারী-হৃদয় বেদনা-বন্ধনে টানিয়া আনিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারেন না। তপোবন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত ইঁহার গতি অব্যাহত। যে দিল্লী

রাজশালায় যম, বায়ু, অগ্নি সকলকেই সভয়ে প্রবেশের চেষ্টা করিতে হইত, সেখানেও এই চপলস্বভাব কার্ম্মুক-ধারী কিশোর দেবতাটির অপ্রতিহত প্রভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে; মোগল-সম্রাটের কুমার-কুমারীদের ইতিবৃত্ত চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দিবে। মন্ত্রপূতা রাজপুত সহধর্ম্মিণীর সহিত যদি বিবাহমাত্রই হইল, তবে উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের উপর মীনধ্বজ মন-সিজ মনের সুখে দৌরাত্ম্য করিলে তাহার গতিমুক্তি কে করে? মন্মথের অত্যাচার অকারণ হয় না; কার্য্য-কারণ ভাবের একত্র সন্নিবেশ না হইলে তাঁহার পুষ্প-ধনুর টঙ্কার কাণে আসিয়া পঁহুছায় না।

অম্বররাজকুমারী বর্ত্তমানেও যখন যুবরাজ সেলিম মেহেরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের উপর পুনরায় অনঙ্গদেবের শরবর্ষণ হইবে না একথা মেহেরের মন যদি বিশ্বাস না করে, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? তাই রাজ্যেশ্বরের সহিত শের-বিধবার পরিণয় সম্পাদিত হইয়া গেলে রাজাবরোধের প্রাপ্তবয়াঃ এবং অনাগত-যৌবনা সুন্দরীর দলকে, সম্ভাবিত সপত্নী হইবার ভয়ে মেহের-উন্নিসা একে একে সুকৌশলে আমীর ওম্‌রাহ-দিগের সহিত বিবাহ দিয়া রংমহল হইতে বিদায় দিলেন। তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে বিষপ্রয়োগে,

অন্যায় দোষারোপ করিয়া সর্প-দংশনে বা উদ্বন্ধনে প্রতিদ্বন্দ্বিনীদিগকে হত্যা না করিয়া, যথাযোগ্য পাত্রে তাহাদের জীবনের ভার দিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পথ করিয়া দেওয়া দূষণীয় হইয়াছে একথা আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। সাম্রাজ্য, ক্ষমতা, আধিপত্য—এসবগুলিও লোকে অবস্থানুসারে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন অজ্ঞাত বিধানের পরিণতির জন্য দুইটি নরনারীর মধ্যে হৃদয়ের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন সুদূর সম্ভাবনাকেও তাহারা জ্ঞাতসারে প্রশ্রয় দিতে চাহে না, বরং সময়ে সময়ে কাল্পনিক ভয়ে পর্য্যন্ত ভীত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যদি আপনাদের ক্ষুদ্র প্রেম-নীড়টুকুকে নিষ্কণ্টক রাখিতে পারে, তাহাতেও দ্বিধা করে না।

মেহেরের তাহাই হইয়াছিল। জীবন-প্রভাতের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এই কিশোর-কিশোরীর শুভ-দৃষ্টি ঘটাইয়া অশরীরী দেবতাটি তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের আকর্ষণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরস্পরকে যে সরল পথ দেখাইয়া দেয়, সমাজ-দেবতা সে সহজ পথে বিচরণ করিবার অশেষ অন্তরায় সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। যে হতভাগ্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে না চলিবে, তাহার সব পথই বন্ধ! সুতরাং

উপায়হীন তরুণ-তরুণীকে জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞদলের প্রদর্শিত নিরানন্দ-বর্ত্মেরই অনুসরণ নিরুপায়ভাবে করিতে হয়; এবং তাহা সংশোধনের জন্য যত বড়ই প্রাণের ব্যাকুলতা হউক না কেন, পুটপাকের ন্যায় অন্তর্দাহ হৃদয়ের নিভৃততলে গোপন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে হাস্যমুখেই বিচরণ করিতে হইবে, ইহাই আমাদের সর্ব্বসহা বসুন্ধরার সনাতন সমাজ-প্রথা। এই প্রথার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া কত নিদারুণ দুঃখভার-নিপীড়িত হৃদয়ের হাহাকার রবে আকাশস্থ বায়ুস্তর বিষদিগ্ধ ও ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিবার আমাদের অবসর কোথায়!

প্রিয়-বিরহ ও অপ্রিয়-সম্মিলনের দারুণ দুঃখভারে পৃথিবী একান্ত ম্রিয়মানা; জগতে এমন কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি এই চিরন্তন দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। এই প্রিয়-বিরহের দারুণ দুঃখেই মেহেরের কৈশোর হইতে যৌবনের শেষ সীমা-রেখা পর্য্যন্ত একভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। আজ এই সমাসন্ন প্রৌঢ়ে অন্ধকারময় সন্ধ্যা-সমাগমের প্রতীক্ষার অতৃপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার হিম-সন্নিপাতে জ্যোতিহীন জীবন-সূর্য্য যখন হেমন্তের অপরাহ্লের ন্যায় মৃদুরশ্মি বিকীরণ করিয়া অস্তাচলের অজ্ঞাত গুহাভিমুখে শঙ্কিত চরণে চলিয়াছে, তখন রাজরাজেশ্বরের প্রেমাকুল

আহ্বানে মেহের-উন্নিসার শরীর-মন কি অনির্ব্বচনীয় পুলক-সঞ্চারে স্পন্দিত হইতেছিল তাহা মেহের ভিন্ন অপরের বুঝা অসম্ভব। যখন জীবনের সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থের মিলনাশা দুরাশা জ্ঞানে পরপারের অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও অজ্ঞাত ভয়ের মধ্যে ব্যর্থ জীবনের অবসানের জন্য একান্ত মনে অপেক্ষা করিতেছিল, তখন অকস্মাৎ যদি আজীবনের বাসনার ধন তাহার ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইবার জন্য আকর্ষণ করে, তখন সর্ব্বস্ব তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াও সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রেম-নীড়টুকু সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ করিবার অনুষ্ঠানে কেহ কি বিরত হইতে পারে ? যদি স্বল্পাবশিষ্ট জীবনের শেষতম নিমেষগুলিকে প্রিয়-সান্নিধ্যের মধ্যে সার্থক করিবার জন্য মেহের-উন্নিসা অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, তবে তাহা নীতিমানের চক্ষে দূষণীয় যদিই বা হয়, হৃদয়বানের নিকট পরম রমণীয় বলিয়া চির আদরের ধন রূপে চিরকালই পূজা পাইবে।

আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর জাহাঙ্গীরের হৃদয়রাজ্যে মেহের সর্ব্বময়ী হইলে, তাহার চিরপ্রিয় দয়িতের দোষগুলি একে একে সংশোধন করিবার যত্ন তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

জাহাঙ্গীরের সমকালবর্ত্তী ও উত্তরকালের ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সুরাসক্তির প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, আমাদের অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই বড়, তাঁহাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কাল্পনিক নানা প্রকারের দোষ কীর্ত্তন করিয়া আমরা বড়ই প্রীতি অনুভব করি। ইহাতে আমাদের লাভ যে বিশেষ কিছু হয় তাহা বলা কঠিন, এবং যাঁহাদের লোকসান করিবার জন্য কর্ম্মহীন সান্ধ্য-বৈঠকে আমাদের উদ্দাম কল্পনার মুখ হইতে বল্‌গা রশ্মি সব খুলিয়া ফেলিয়া তাহার অবাধ গতির প্রশ্রয় দিই, তাঁহাদেরও কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে পারি কি না জানি না,—তথাপি এ স্বভাব আমরা ছাড়িতে পারি না। যদি কাহারও চরিত্রে কোন দোষ থাকে এবং তাহার জন্য আমার মনকে পীড়িত করিয়া তুলে, তবে বন্ধুভাবে তাহার সংশোধন চেষ্টা না করিয়া তাহার অবাধ আলোচনায় উভয় পক্ষের কি ক্ষতিবৃদ্ধি তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

সে যাহা হউক, একাল পর্য্যন্ত অনেক মহিষীই দিল্লী রংমহলের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রকৃতিগত সুরাসক্তি কমাইবার চেষ্টা কেহ করিয়াছিলেন কি না ইতিহাসে সে কথা আমরা পাই নাই। মেহের যখন মহিষী হইয়া বসিলেন, তখনই

এ চেষ্টা আমরা প্রথম দেখিতে পাই। চেষ্টার ফলও যথেষ্ট ফলিয়াছিল। আমরা স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিজমুখে শুনিয়াছি যে, মেহের-উন্নিসা তাঁহাকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কদাচ পানপাত্র স্পর্শ করিতে দিতেন না এবং রজনী সমাগমে যেটুকু পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাদশাহের শরীর মনের বিশেষ কোন হানি করিতে পারিত না। প্রেমাস্পদের চিত্তক্ষেত্রে মেহের যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তজ্জনিত ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা যথাযথ পরিচালনা আর হইতে পারিত কি না বলা কঠিন। যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, যাহার সুখ-দুঃখ স্বাস্থ্য-রোগ সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সহিত আমার নিজের অদৃষ্টকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছি, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাময় করিবার চেষ্টার ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসনীয় উত্তম জগতে আর কিছু হইতে পারে কি না জানি না ; এবং সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ভারত-পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মেহেরের ন্যায় প্রণয়শালিনী ও রূপবতী ভার্য্যা ব্যতীত আর কেহ সফলমনোরথ হইবার মত শক্তি সামর্থ্যও রাখিতেন কি না, রংমহলের ইতিবৃত্ত সে সম্বন্ধে একান্ত নীরব।

স্বামীর সুরাসক্তি নানা উপায়ে কম করিতে গিয়া অনেক সময়ে জাহাঙ্গীরের হস্তে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বিশেষ লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে ; তথাপি

প্রিয়-গত-প্রাণা পত্নীর কর্ত্তব্যপথ হইতে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্ঞীকে বিচলিত হইতে কেহ দেখে নাই। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ইহা বিশেষ প্রশংসার্হ না হইতে পারে, কিন্তু রাজাবরোধের বিশেষজ্ঞেরা রাজ্ঞীর পক্ষে ইহা অনন্যসাধারণ গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

মদিরাঘটিত একরাত্রির দুর্ঘটনা নিম্নে বর্ণন করিতেছি। একদা জনাব-আলী জাহাঙ্গীর শাহ সন্ধ্যার নির্দ্দিষ্ট পাত্রগুলি নিঃশেষ করিয়া, আরও পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দৃঢ়তার সহিত সে অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকার করেন। সুরাসেবী অনেক সময়েই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া থাকে; বাদশাহ বলিয়া উগ্র মদিরার ক্রিয়া মানব-শরীরে কম হয় না। ইচ্ছানুরূপ মদ্যপান করিতে না পারিয়া ক্রোধোন্মত্ত সম্রাট্ রাজ্ঞী নূর-জাহানকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অভিমানে নূরজাহান তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিক পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করেন নাই। বরঞ্চ পরিমাণের অধিক আসব সেবনে বাদশাহের শরীর মনের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা সম্রাজ্ঞীকে কর্ত্তব্যে অবিচলিত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

রজনীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা সুরাপানোন্মত্ত সম্পূর্ণ

এ চেষ্টা আমরা প্রথম দেখিতে পাই। চেষ্টার ফলও যথেষ্ট ফলিয়াছিল। আমরা স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিজমুখে শুনিয়াছি যে, মেহের-উন্নিসা তাঁহাকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কদাচ পানপাত্র স্পর্শ করিতে দিতেন না এবং রজনী সমাগমে যেটুকু পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাদশাহের শরীর মনের বিশেষ কোন হানি করিতে পারিত না। প্রেমাস্পদের চিত্তক্ষেত্রে মেহের যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তজ্জনিত ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা যথাযথ পরিচালনা আর হইতে পারিত কি না বলা কঠিন। যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, যাহার সুখ-দুঃখ স্বাস্থ্য-রোগ সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সহিত আমার নিজের অদৃষ্টকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছি, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাময় করিবার চেষ্টার ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসনীয় উদ্যম জগতে আর কিছু হইতে পারে কি না জানি না ; এবং সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ভারত-পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মেহেরের ন্যায় প্রণয়শালিনী ও রূপবতী ভার্য্যা ব্যতীত আর কেহ সফলমনোরথ হইবার মত শক্তি সামর্থ্যও রাখিতেন কি না, রংমহলের ইতিবৃত্ত সে সম্বন্ধে একান্ত নীরব।

স্বামীর সুরাসক্তি নানা উপায়ে কম করিতে গিয়া অনেক সময়ে জাহাঙ্গীরের হস্তে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বিশেষ লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে ; তথাপি

প্রিয়-গত-প্রাণা পত্নীর কর্ত্তব্যপথ হইতে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্ঞীকে বিচলিত হইতে কেহ দেখে নাই। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ইহা বিশেষ প্রশংসার্হ না হইতে পারে, কিন্তু রাজাবরোধের বিশেষজ্ঞেরা রাজ্ঞীর পক্ষে ইহা অনন্যসাধারণ গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

মদিরাঘটিত একরাত্রির দুর্ঘটনা নিম্নে বর্ণন করিতেছি। একদা জনাব-আলী জাহাঙ্গীর শাহ সন্ধ্যার নির্দ্দিষ্ট পাত্রগুলি নিঃশেষ করিয়া, আরও পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দৃঢ়তার সহিত সে অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকার করেন। সুরাসেবী অনেক সময়েই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া থাকে; বাদশাহ বলিয়া উগ্র মদিরার ক্রিয়া মানবশরীরে কম হয় না। ইচ্ছানুরূপ মদ্যপান করিতে না পারিয়া ক্রোধোন্মত্ত সম্রাট্ রাজ্ঞী নূরজাহানকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অভিমানে নূরজাহান তাঁহার কর্ত্ত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিক পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করেন নাই। বরঞ্চ পরিমাণের অধিক আসব সেবনে বাদশাহের শরীর মনের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা সম্রাজ্ঞীকে কর্ত্তব্যে অবিচলিত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

রজনীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা সুরাপানোন্মত্ত সম্পূর্ণ

বিস্মৃত হয় না, বিশেষ বিশেষ ঘটনা তাহার মনে থাকিয়াই যায়। জাহাঙ্গীর এত বড় কথাটা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং প্রভাতে উঠিয়াই বিগত ঘটনার জন্য অনুশোচনা এবং রাজ্ঞীর ক্ষমালাভ তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। নূরজাহান ক্রোধ-বশতঃ কর্ত্তব্যপথ হইতে সে রাত্রে ভ্রষ্ট হন নাই সত্য, কিন্তু যাহার উপকারার্থ দারুণ কর্ত্তব্য করিতে গিয়া চিরপ্রিয় দয়িতের হস্তে দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার উপর অভিমান হওয়া স্ত্রীহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; এবং ইতিহাসে পড়িয়াছি, এই মানাভি-মানের পালা শেষ করিতে ভারতপতি জাহাঙ্গীরকে জয়দেব গোস্বামীর ন্যায় "দেহি পদপল্লবমুদারং" পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছিল।



সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহিণী সচিবঃ

বেদ বেদাঙ্গ পুরাণ ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া হয়তো দেখান যাইতে পারে যে, কোন এক সময়ে গার্গী মৈত্রেয়ী অরুন্ধতী প্রভৃতি ভারত-রমণীগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় অন্তঃ-পুরের চতুঃসীমার বাহিরে পর্য্যন্ত গিয়াছে; কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে রমণীর রাজত্ব অন্তঃপুরে, ইহাই আমরা জানিয়া আসিতেছি। মুসলমান অধিকারের সময়ে পাঠান রাজত্বকালে একমাত্র সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার রাজ্যশাসন কথা আমরা জানি। মোগল শাসনাধীন ভারতবর্ষে অবরোধপ্রথা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, চিকিৎসককেও পর্দ্দার বাহির হইতে অনুমানে রোগীর ব্যবস্থা করিতে হইত, জীবন মরণের সমস্যার সময়েও অবরোধবাসিনীর কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিবার উপায় ছিল না। অন্তঃপুর-চতুঃসীমার বাহিরে জগৎ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও তাঁহাদের জানিবার উপায় ছিল না। রংমহলের সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর দল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অত্যাবশ্যকীয় নিত্যকৃত্যগুলি কোনরূপে অবরোধের

প্রাচীরসীমার মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিতেন; বহির্জ্জগতের তপন-তারকা-খচিত বাসন্তি-চন্দ্রিকা-বিধৌত সুনীলাকাশের সুষমা, পত্রপুষ্প-পরিশোভিতা তৃণস্তীর্ণা শ্যামা বসুন্ধরার হরিৎ-শোভা, মলয়াচল-সম্পৃক্ত মন্দানিলের দক্ষিণস্পর্শ দিল্লীরাজশালার পঞ্জরস্থা শারিকাদলের ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। জাহাঙ্গীরের জীবিতরূপিণী মেহের-উন্নিসার স্ত্রীজনদুর্লভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা রাজাবরোধের নির্জ্জন কারাবাসে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপব্যয়িত হইবার জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই; জগতের ইতিহাসে এই অসধারণ রমণীরত্নের অনন্যদুর্লভ অলৌকিক সদ্‌গুণরাজির বৃত্তান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে—ইহাই বিধিলিপি; সুতরাং তৎকাল প্রচলিত অবরোধপ্রথা তাঁহাকে অন্তঃপুরের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, বিধিকৃত বিধানকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করিবার জন্য ভারতভাগ্যবিধাতা জাহাঙ্গীর চিরাচরিত মুসলমান প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার নর্ম্মসহচরী নূরজাহানকে ধীরে ধীরে কর্ম্মসহায়স্বরূপিণী করিয়া লইতে লাগিলেন।

অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে মেহের যে সূচী ও চিত্রশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জনিত সৌন্দর্য্যানুভূতি তাঁহার মনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অঙ্গহীন

অসম্পূর্ণ শোভা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিত না ; এবং শালীনতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্ব্বরোচিত উৎকট উপভোগে তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেন না।

ভুবনবিশ্রুত দিল্লী-দরবারের শ্রীসম্পদ বহুপরিমাণে নূরজাহান বেগমের মনঃকল্পিত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে উৎসবের দিনে দিল্লী-রাজশালায় যে সকল আনন্দ-অনুষ্ঠান হইত, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শালীনতা রক্ষিত হইত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন ; কিন্তু মেহেরের সম্রাজ্ঞী হইবার পর যে সকল উদ্যোগ আয়োজনে তাঁহার শ্রীহস্তের চিহ্ন পড়িত, সে সমুদয় অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদের উজ্জ্বলালোকে হাস্যময় হইয়া উঠিত। রাজাবরোধের সুন্দরীর দল পূর্ব্বে মূল্যবান পরিচ্ছদ-প্রচুর আবরণে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেন, কিন্তু মেহেরের আবিষ্কৃত লঘুভার অঙ্গাবরণ যে তাঁহাদের বরবপুর শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল একথা কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গোলাপের আতর মেহেরের জননী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; কাহারও মতে মেহেরই স্বয়ং এই অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অবগাহনের নিমিত্ত পূর্ব্বরাত্রে স্নানাধার গোলাপে পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হয়, পরদিন প্রাতে দেখা যায় যে, তৈলের

ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জলের উপরে ভাসিতেছে। প্রথমতঃ, কেহ স্নান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া সম্রাজ্ঞী নিতান্ত রুষ্ট হইয়া উঠেন; পরে পরীক্ষায় দেখা গেল, ঐ তৈলবৎ ভাসমান পদার্থ আর কিছুই নহে, জলের উপরে গোলাপফুলের নির্য্যাস ভাসিতেছে। সেই দিন হইতে আতর বাহির করিবার প্রক্রিয়া সমাজে প্রচারিত হইল। এই গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, মেহেরের জননী অপেক্ষা এই আবিষ্কার-কার্য্য মেহেরের পক্ষেই অধিক-তর সম্ভব বলিয়া মনে হয়, কারণ দিল্লীশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী ব্যতীত স্নানাধার গোলাপজলে পরিপূর্ণ করিয়া নিত্যস্নানের ব্যবস্থা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

আবহমান কালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে দিল্লী-শ্বরকে প্রতিদিন দরবারের প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া তাহাদের আবেদন নিবেদন শুনিতে হইত। এই দরবারের শ্রীসম্পদ শোভা জাঁক-জমক এতই নয়নাভিরাম ছিল যে, দেশান্তরের রাজপ্রতি-নিধিগণও এই রাজসভার যথাযথ বর্ণনা শতমুখে করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় পরাক্রান্ত নৃপতি-বর্গের রাজদূতগণ, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী রাজসভায় নিত্য গতায়াত করিতেন, তাঁহারাও ভারতবর্ষের মোগল-রাজসভার বর্ণনা করিতে গিয়া সে ভাষাতীত সম্পদ-

সৌন্দর্য্যের আভাস-মাত্রই দিতে পারিয়াছেন, উহার পরিপূর্ণ শোভার চিত্র তাঁহাদের লেখনী আঁকিতে পারে নাই। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, কি রাজসভা, কি মৃগয়াভিযান, কি সমরযাত্রা—সর্ব্বত্রই সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শ্রীহস্ত তাহাদের পারিপাট্য বিধান করিয়া দিত। সম্রাট জাহাঙ্গীর সুখময় কৈশোরে ভুবনৈকসুন্দরী কিশোরী মেহেরের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট প্রাণীযুগলের আনন্দ-মিলন ঘটিবার তৎকালে অবসর হয় নাই; এবং সেজন্য সুদীর্ঘ-কাল অপেক্ষা করিয়া নানারূপ লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিতকে রাজান্তঃপুরে পাইয়াও পরীক্ষার্থ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে বহু অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল তাহা জানি; এবং সেই জন্যই এই চিরারাধ্য চিরাগতার আনন্দস্পর্শ-দ্বারা সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়কেই শ্রীসম্পন্ন, জয়যুক্ত ও আনন্দোজ্জ্বল করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা জাহাঙ্গীরের মনে চির-জাগরূক থাকিত। প্রেমাকুলিত অন্তঃকরণের ইহাই যেন স্বাভা-বিক ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহরস যাহার পাদপদ্মে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছি, লক্ষ উপলক্ষে তাহার প্রিয়নাম বার বার করিয়া উচ্চারণ করিবার জন্য বাগ্‌যন্ত্র মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ব্যাকুল হইয়া উঠে, প্রিয়-

প্রসঙ্গ বারম্বার আলোচিত হইলেও তৃষ্ণা যেন মিটিতে চাহে না, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, সেবা পরিচর্য্যা আহ্লাদ আমোদ রোগ শোক উৎসব ব্যসন সকলেরই মধ্যে প্রিয়জনের প্রেমহস্তাবলেপ না দেখিতে পাইলে পরিতৃপ্তির পরমানন্দ আমাদের জীবনসংগ্রাম-ক্লিষ্ট ম্রিয়মান মনকে সঞ্জীবন-ধারায় অভিসিঞ্চিত করে না; তাই সম্রাজ্ঞী হইলেও রাজাধিরাজ তাঁহাকে কর্ম্মক্লেশ হইতে অব্যাহতি দেন নাই।

রজনীর নর্ম্মলীলাবসানে সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিত সম্রাট্‌কে দর্শন করিবার জন্য যখন দিল্লী-নগরীর মহাজনসঙ্ঘ প্রাসাদনিম্নবাহিনী যমুনার উপকূলে নিত্য সমবেত হইয়া রাজাধিরাজের জয়গানে প্রভাতের নির্ম্মলাকাশ মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন চিরাচরিত মুসলমান প্রথার বিরুদ্ধে জনাব-আলী জাহাঙ্গীর শাহ তাঁহার প্রাণপ্রিয় মেহেরকে বামে লইয়া বাতায়নপথে প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দিতেন। দ্বিপ্রহরের প্রকাশ্য "আম-দরবারে" বাদশাহ যখন দ্বিতীয় বাসবের মত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিভিন্ন দেশীয় রাজদূতদিগের সম্বর্দ্ধনা করিতেন এবং অতিথিবৃন্দের আবেদন নিবেদন শুনিতেন, তখনও সিংহাসনের পশ্চাতে পটান্তরালে প্রিয় মহিষী নূরজাহানকে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে হইত।

যে সকল জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা পাত্র মিত্র মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতির অসাধ্য হইত, রাজমহিষী নূরজাহান তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাকে রাজসভায় যাইবার প্রয়োজন হইত এরূপ মনে হয়না ; সে কার্য্য অনায়াসে অন্তঃপুরে বসিয়াও সাধিত হইতে পারিত। বিধিবিড়ম্বনায় বহুবর্ষ ধরিয়া যাহার দুর্ব্বিষহ বিরহদুঃখে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রাণাধিক-প্রিয় যখন দৈবানুগ্রহে মরুশুষ্ক-জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট শেষের দিনগুলিকে প্রেমের পুলক-ধারায় আনন্দময় নন্দন-শোভায় পরিণত করিতে স্বেচ্ছায় সমাগত, তখন তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নান্তরাল করা বোধ করি দেব মানব সকলেরই দুঃসাধ্য। প্রতি দিবসের জীবনযাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজনগুলি প্রিয়জনের সেবা-হস্তের স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়া উপভোগের পরমতৃপ্তি দিবার জন্য উদ্বাহু হইয়া আহ্বান করিলে সেগুলির মধ্যে পরিমাণাতিরিক্ত সুখ আমরা পাই ; এবং সে সুখ আমা-দিগকে পরিপূর্ণভাবে বিহ্বল করিয়া সংসারের অপরাপর সর্ব্বপ্রকার সম্ভোগ হইতে দূরে সরাইয়া সেবানিরতা প্রিয়জনের উপর একান্ত নির্ভরপরায়ণ অক্ষম শিশু করিয়া তুলে ; আর সেই অক্ষমতার নাট্যলীলার মধ্যে আমরা প্রিয়জনকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিকটে আকর্ষণ করিয়া সেই সান্নিধ্যের মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দের অনির্ব্বচনীয়

রসাস্বাদে বিভোর হইয়া থাকি। শাহান-শাহ বাদশাহ জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীরের কিছুরই অভাব ছিল না, তথাপি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরে মেহেরের প্রেমমুগ্ধ-দৃষ্টিপাতের একান্ত আবশ্যকতা ছিল বলিয়াই, দিন রাত্রির দণ্ড পল মুহূর্ত্তগুলি রাজাধিরাজ তাঁহারই সাহচর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

সাবধান ব্যক্তির পণ্যক্রয়ের মত, শতবার করিয়া দোষগুণ বিচার করতঃ আমরা আমাদের প্রেমাস্পদকে ভালবাসি না; প্রেম যখন আসে তখন আমাদের হৃদয়-কক্ষের নিভৃত প্রদেশে সবলেই প্রবেশলাভ করিয়া নবোদিত ঊষার ন্যায় আমাদের চিত্ত-তমের সব অন্ধকার উদ্ভাসিত করিয়া তুলে এবং তাহার সমুজ্জ্বল আলোকের সুনির্ম্মল ধারায় প্রেমাস্পদকে সুন্দরতম করিয়া আমাদের হৃদয়-রাজ্যের একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। প্রথম প্রণয়ের প্রবল বন্যার মুখে প্রেমাস্পদকে সকল সৌন্দর্য্য ও সর্ব্ব সম্পদের একমাত্র আধার বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাহার দেহ-মনের কোন দৈন্যই আমরা তৎকালে অনুভব করিতে পারিনা; প্রথম প্লাবনের প্রবল বেগের মুখে সব ভাসিয়া গিয়া, যতদূর চক্ষু যায়, কেবল এক অখণ্ড ঊর্ম্মিচঞ্চল নৃত্যপরায়ণ অধীর বারি-রাশিই আমরা দেখিতে পাই—তাহার কূল নাই, অন্ত নাই, অবধি নাই। ব্রহ্মকমণ্ডলু-উচ্ছলিতা ধূর্জ্জটির জটা-নিষ্যন্দিনী মন্দা-

কিনীর প্রবল গতির পরাক্রান্ত বেগে বাসবের বৃহৎ বারণ যেমন তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ প্রথম প্রণয়ের উদ্দাম গতিমুখে প্রেমাস্পদের দোষগুণ-বিচারাক্ষম বিবেক-বুদ্ধি আমাদের হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করে। কাল-ক্রমে পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষ যখন আমাদের শ্রুতিমূলে মন্দীভূত হইয়া আসে, তখন প্রাণপ্রতিম প্রিয় প্রাণীটির অন্তরের বৈভবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহার অশ্রান্ত পরিচর্য্যা ও অপরিম্লান হিতৈষণা আমা-দিগকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আকর্ষণ করিয়া প্রিয়-সাহচর্য্যের জন্য প্রতিনিয়ত উন্মুখ করিয়া রাখে। যেখানে সেই পরি-চর্য্যা ও হিতৈষণার অভাব লক্ষিত হইয়াছে, সেইখানেই মন্থিত প্রেমসমুদ্র হইতে সুধা শশী ও লক্ষ্মী প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বিশ্ববিধ্বংসী কালকূটের উদ্ভব হইয়া কতশত হতভাগ্যকে নীলকণ্ঠ সাজাইয়াছে, তাহার সংখ্যানির্ণয় সুকঠিন।

ভারতসম্রাট্ বিশ্ববিজয়ী জাহাঙ্গীর শাহ তরুণ বয়সে মেহের-উন্নিসার পাণিগ্রহণ করিবার সুযোগ পান নাই; পাইলে মেহেরকে কি সম্মান, কি গৌরব, কতটুকু অধিকার ও কি পরিমাণ প্রেম দিতে পারিতেন বলা কঠিন। যৌবনের ঔদ্ধত্যবশে, সম্পদের উন্মাদনায় তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটিত কি না কে বলিবে? এবং অপরিণত বয়সে রাজাধিরাজের পর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও

অপরিমেয় প্রেম পদতলগত দেখিয়া আজন্ম-দারিদ্র্য-পীড়িতা মুগ্ধা মেহেরের মনকে কতখানি অবিনয় আসিয়া অধিকার করিত, তাহা বলা যায় কি ? সে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিবে না বলিয়াই, নানাসূত্রে অবলম্বন করিয়া উভয়ের আনন্দময় প্রেমসম্মিলন ঘটিতে বিলম্ব হইয়াছে। শান্তোজ্জ্বল কিরণমণ্ডিত শরৎসন্ধ্যার ন্যায় স্নিগ্ধ প্রৌঢ়ের মাধুর্য্যময় মুহূর্ত্তে রাজদম্পতীর মিলন হইয়াছিল বলিয়াই সে আনন্দমিলন আজীবন অক্ষুণ্ণ ও অকলঙ্কিতই রহিয়া গিয়াছে। মেহের-উন্নিসা পরিণত-প্রৌঢ়ে নারীজীবনের সমগ্র দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই সেবা সহানুভূতি প্রেম ও পরিচর্য্যা দ্বারা রাজরাজের হৃদয়স্থ অচলাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন।

মেহের অনন্যসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে আসমুদ্র-বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যের পরিচালনে বাদশাহকে অনেক সদুপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে অনেক শুভফল ফলিয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য আজিও দিতেছে। কার্য্যে নিপুণতা, বুদ্ধি-কৌশল, রাজনীতিজ্ঞান প্রভৃতির পরিচয় প্রতিকার্য্যে পাইয়া বাদশাহ প্রতি বিষয়েই সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কিছুদিন এইরূপ চলিবার পর ধীরে ধীরে বাদশাহ নূরজাহানের হস্তেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিজে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবার

ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় গুরুতর কার্য্যের সমাধানকল্পে যদি কোনরূপ আদেশ উপদেশ দিতে হইত, তাহাই কেবল বাদশাহ স্বয়ং দিতেন, নতুবা রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রী মীরজা-গীয়াস ও কোষাধ্যক্ষ আসফ খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া করিতেন। মীরজা-গীয়াস সম্রাজ্ঞীর পিতা এবং আসফ খাঁ সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতা; ইঁহারা উভয়েই রাজকার্য্য-বিশারদ, সদ্বিবেচক, ধীর, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন; এবং সাম্রাজ্যে তৎকালে তাঁহাদের ন্যায় হিতৈষী কর্ম্মচারী আর কেহ ছিল না বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। রাজ্ঞীর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিবলে উচ্চ পদ লাভ করিবার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া ইতিহাস বারম্বার তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছে।

মোগল বাদশাহদিগের রাজত্বকালে অনেক বিধি-নিয়মের মধ্য দিয়া রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, তাহার ব্যতিক্রম কোন দিন কোন কারণেই ঘটিতে পারিত না। বাদশাহ ব্যতীত রাজপরিবারের অন্য কাহারও নাম মুদ্রার উপরে অঙ্কিত হইবার নিয়ম ছিল না; এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় মসৃজিদে "খুৎবা" পাঠের সংকল্প অন্য কাহারও নামে হইতে পারিত না। এমন কি, শাহজাদা বা বেগমগণেরও নাম এই দুই কার্য্যে ব্যবহার করিবার রীতি ছিল না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে

ইহার বতিক্রম ঘটে। মেহের-উন্নিসার সহিত সম্রাটের বিবাহ হইবার কিছুকাল পরে রাজাজ্ঞায় সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের নাম তৎকাল-প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রার উপরে খোদিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বাদপ্রতিবাদ তর্ক-বিতর্ক অনেক হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই সম্রাটের ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্য হইতে পারে নাই। বিধি নিষেধ সমস্তই রাজাজ্ঞার উপর নির্ভর করে; বাদশাহের ইচ্ছা হইলে এক নিয়মের পরিবর্ত্তে অন্য নিয়মের প্রচলন হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে; এবং যেখানে বাদশাহ তাঁহার নিজ প্রিয়তমা মহিষীর সম্মান বৃদ্ধি করিবার মানসে মুদ্রার উপরে তাঁহার নাম খোদিত করিতে চাহিতেছেন, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ নিতান্তই নিস্ফল, একথা বলাই বাহুল্য। শুনিতে ঘটনাটি সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তৎকালে বড় সহজসাধ্য ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

মুসলমান সম্প্রদায় চিরদিনই প্রাচীন প্রথার অনু-কূল; এবং স্ত্রীজনের দৈহিক মাধুর্য্যের উপরে ইহাদিগের বিশেষরূপ পক্ষপাত থাকিলেও, বর্ত্তমান যুগের সাম্য-নীতির সুদূর কল্পনাও তৎকালে তাহাদের মনে আসি-বার কোন কারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশকালের চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতিকূল কোন কার্য্যদ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান বৃদ্ধি নিতান্ত সামান্য

ঘটনার মধ্যে গণ্য নহে; এবং রাজদম্পতীর মধ্যে কি দুশ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন বর্ত্তমান ছিল, তাহা এই একটি ঘটনা হইতেই আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। যে রাজ্ঞীর আদেশে সাম্রাজ্য পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় রাজ্যে মুহূর্ত্তে প্রলয় ঘটিয়া যাইতেছে, যাঁহার প্রেমের নিদেশ পালন করিবার জন্য রাজ্যেশ্বর যোড়-হস্ত ও সদা শশব্যস্ত, যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে কত রাজ্য রাজধানী ও রাজার অভ্যুত্থান ও পতন অবলীলায় ঘটিয়া যাইতে পারে, প্রেমপরায়ণ স্বামীর আজ্ঞায় ও ইচ্ছায় স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার নাম যোজনা বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশেই অসম্ভব বা কঠিন ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি না হইলেও, তৎকালে ইহা এক অপূর্ব্ব স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে মুদ্রার উপরে পারস্য ভাষায় শ্লোক রচিত হইয়া খোদিত হইবার রীতি ছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে নূরজাহানের নাম যোজনা উপলক্ষে যে পারসী 'শেরটি' রচিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রায় খোদিত হয়, তাহা এই—

ব হুকুমে শাহে জাহাঙ্গীর য়াফ্ত্ সদজিযুর।
জনামে নূরে জাঁহা বাদশাহ বেগম জর্॥

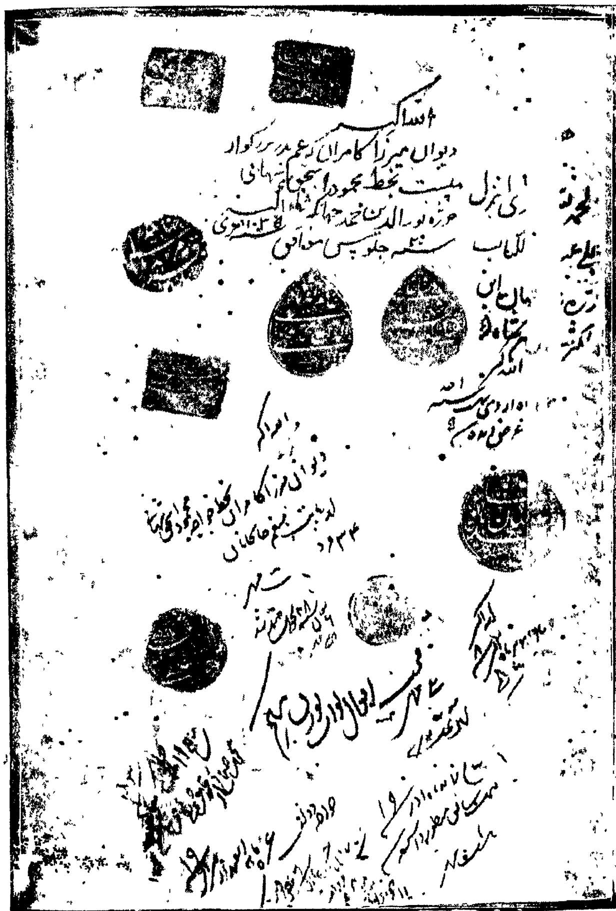
"সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নাম সংযোজিত হইয়া সুবর্ণের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল"—ইহাই এ শ্লোকের

অর্থ। যাঁহার পাদস্পর্শে রাজপুরী ধন্য হইয়াছে, যাঁহার প্রেম-মহিমায় রাজাধিরাজ কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার নিদেশ-পালন করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য সফলকাম, তাঁহার নাম সংযোগে স্বর্ণের সম্মান শতগুণ বর্দ্ধিত হওয়া বড় বিচিত্র কথা নহে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কবিতা রচনার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ। তাঁহার রচিত বহুতর কবিতা-গ্রন্থ তৎকালে বিদ্বজ্জনসমাজে বহু আদর লাভ করিয়া গিয়াছে। কবিতায় পাদপূরণের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল এবং এই গুণে তিনি সম্রাটের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে 'শায়েরগণ' রাজসন্নিধানে তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিবার জন্য সমাগত হইতেন। এই সকল কবি-সভার সন্নিকটে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে রাজমহিষী নূরজাহান কবিগণের সহিত পাদপূরণ ব্যাপারে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে কোন ভাবের যে কোন ছন্দের কবিতার অর্দ্ধাংশ শুনিবামাত্র, তাহার অপরার্দ্ধ তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া গুণগ্রাহীর মনোরঞ্জন করা সকলেরই পক্ষে শ্লাঘার কথা; অবরোধবাসিনী প্রাচ্যরমণীর পক্ষে ইহা অভূতপূর্ব্ব গৌরবের বিষয়। পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধে যুগ-যুগান্ত হইতে পুরুষের সহিত রমণীগণ শিক্ষাদীক্ষা-ব্যাপারে সমানাধিকার পাইয়া আসিতেছেন; সেখানেও যখন

কোন রমণীর এইরূপ কোন গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার যশোগাথায় দিগন্ত পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে; আর এই ধরণীর পূর্ব্বপ্রান্তে, অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমানবধূর অনন্যসাধারণ গুণের কথা আজ চারিশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই আমরা নিঃশেষে তাহা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া বসিয়া আছি। ইহার পর যদি কেহ বলে আমরা ইতিহাসের মর্য্যাদা জানিনা, সে অপযশ আমাদিগকে অবনত মস্তকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক সময় ছিল, যখন পারস্যের ও মধ্য-এসিয়ার উচ্চ ভূমিখণ্ডের "গুল্‌বাগ" নিচয় সুধাকণ্ঠ "বুল্ বুল্" সমূহের কলগীতিঝঙ্কারে অনুদিন ঝঙ্কৃত হইত; আজ সে কবিনিকুঞ্জ শ্মশানের নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। সর্ব্বগ্রাসী কাল-সমুদ্রের কল্লোলের উপর দিয়া কদাচিৎ কোন অপূর্ব্ব তান ভাসিয়া আসিয়া চিত্ততলের কত কি গুপ্ত কথা ও লুপ্ত বাসনা মুহূর্ত্তের জন্য জাগাইয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করে; কেবল অকৃতকার্য্য অকথিত বাণী এবং অতৃপ্ত আশার অব্যক্ত বেদনা হৃদয়কে দুর্ব্বহ-ভার-প্রপীড়িত ও মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়া যায়। নূরজাহানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, কিন্তু তিনি যাঁহাকে তাঁহার অন্তরের প্রেম, অনবদ্য সৌন্দর্য্য, অশ্রান্ত পরিচর্য্যা, অনন্যদুর্লভ কবিত্ব, রাজকার্য্যে সহায়তা, শিবিরে

সঙ্গ, সৈন্যপরিচালনায় সাহস, দুঃখে সান্ত্বনা, বিলাসে আনন্দ দান করিয়া আজীবন সুখী করিয়াছিলেন, তিনি সম্রাজ্ঞীর কি সুধাসিক্ত স্মৃতি সঙ্গে লইয়া ইহলোক হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারিতেন।



জাহাঙ্গীর বাদশাহের হস্তাক্ষর

(উপরে চতুষ্কোণ মোহরের নিম্নস্থিত ক্ষুদ্রাক্ষর পঞ্চপংক্তি মাত্র)

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমূলক অপবাদ

সমস্ত রাজসংসারে চিরন্তন প্রথা এই যে, রাজানুগ্রহে যদি কেহ অন্য সকলের অপেক্ষা অতিরিক্ত সম্মান বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তবে আর সকলে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং ন্যায় অন্যায় নানারূপ দোষারোপ করিয়া সেই সম্মানিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অযথা নিন্দা রটনা করিয়া কোন প্রকারে মনঃক্ষোভ নিবারণ করে। দিল্লী রাজধানীতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই এবং বাবরের সময় হইতে দিল্লীর শেষ নরপতি বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এরূপ নিরপরাধ রাজানুগৃহীত অনেক লোককে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। শাহজাদা বা সম্রাজ্ঞীগণও এরূপ নীচ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন মেহের-উন্নিসার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্রাজ্ঞীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রাজকার্য্যনিপুণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় পাইলেন, তখন সাম্রাজ্য পরিচালনার অনেক ভার তাঁহার উপর দিয়া, নিজে অনেক পরিমাণে বিশ্রামলাভ করিবার সুযোগ করিয়া লইলেন। যথারীতি রাজকার্য্য পরিচালন করিতে হইলে সাম্রাজ্যের সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা

সুকঠিন ; সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও তাহা পারেন নাই, সুতরাং রাজ্যে ও রাজধানীতে তাঁহার শত্রুসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর শাহের রাজত্বের শেষভাগ প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানেরই রাজত্বকাল বলিতে হয় ; এবং এই কালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যের সকল বিভাগেই প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। রাজস্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্য কাবুল প্রভৃতি প্রদেশের ক্ষমতাশালী শত্রুগণ বিজিত হইয়া দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং রাজধানী ও রংমহলের শোভা সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া লোকলোচনের তৃপ্তিবিধান করিত। রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞীর শত্রুসংখ্যারও বিলক্ষণ উন্নতি দেখা গিয়াছিল এবং এই সকল শত্রুগণের মধ্যে কেহ কেহ মোগল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, ভারত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাট্, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার খস্রুর গোপন হত্যার দুরপনেয় কলঙ্কও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের উপর আরোপ করিতে দ্বিধা করেন নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে নূরজাহানের ন্যায় মন্দ স্ত্রীলোক জগতে আর জন্মিয়াছিল কি না সন্দেহ।

যে নারী-হৃদয়ের স্নেহ-নির্ঝরের শীত-শীকর-সম্পাতে দুঃখতাপ-সন্তপ্ত মানবজীবনে অমৃতের আস্বাদ আনিয়া

দেয়, ধরণীকে ধন্য করিবার জন্য জননী ভগিনী গৃহিণী-রূপে যে নারী মানবের গৃহে গৃহে অবতীর্ণা, যে নারী স্বাস্থ্যে সাহায্য ও রোগে পরিচর্য্যা দিয়া, উৎসবে আনন্দ করিয়া এবং ব্যসনে বেদনা পাইয়া, আমাদের জরা-মরণ-জীর্ণ দুঃখদীর্ণ দৈনিক জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করিয়া রাখিয়াছে, সে যদি একদিন অকস্মাৎ রণচণ্ডীর উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের উষ্ণশোণিত পানের জন্য তাহার লোলরসনা বিস্তার করে, কিম্বা কোন গোপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্ধকার বিবরবাসী কৃষ্ণ-সরীসৃপের মত অতর্কিত অবস্থায় আমাদিগকে দংশন করিবার জন্য তাহার উদ্যত ফণা আস্ফালন করিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তবে বিধাতার বিশ্ব-রচনার এ ভোজের বাজি এক নিমেষে যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়! তা যায় বটে, কিন্তু এরূপ নিদারুণ ঘটনা জগতের ইতিহাসে যে ঘটে নাই তাহা নহে; প্রাচ্য জগতে নারীর নির্ম্মমতার উদাহরণ বিরল হইলেও, প্রতীচ্য ভূখণ্ডের ইতিবৃত্তে সময় সময় আমাদিগকে এরূপ নির্ম্মম কঠিন সত্যের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সে যাহাই হউক, এই প্রবন্ধ-বর্ণিতা সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের নামে উত্তরকালের ঐতিহাসিকগণ রাজপুত্রের গোপন হত্যার যে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন

করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে বা নাই, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

জীবমাত্রেই যে সকল কার্য্য বা অকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, স্বার্থই তাহার মূল-নিদান একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান উন্মাদেই করিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান উন্মাদ ছিলেন একথা কোন ঐতিহাসিক বলেন নাই; সুতরাং যদি তিনি এই রাজ-হত্যা করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করাইয়াছিলেন। সে স্বার্থ কি? খস্রুর মৃত্যু ঘটাইতে পারিলে তিনি ভারত-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইবেন না, ইহা তাঁহার জানা ছিল; তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না যে, তাহাকে ভবিষ্যতে রাজ্য দিবার জন্য পথ পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন; তাঁহার জামাতা রাজকুমার শাহ-রিয়ার জাহাঙ্গীরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, খস্রুর মৃত্যু হইলেও খুরম্ ও পরভেজ দুই ভ্রাতা তখনও জীবিত থাকিবে। সকলকে হত্যা করাইতে পারিলে তবে শাহরিয়ার রাজ্য পাইতে পারে। তিনজন রাজকুমারের হত্যাকার্য্য গোপনে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। একথা বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে এতগুলি পুত্রের হত্যাকারিণী স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকা কাহারই পক্ষে সম্ভব নহে; বাদশাহের

অনুগ্রহই নূরজাহানের একমাত্র বল ভরসা সম্বল। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে কোন স্বার্থই সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু যাঁহার কৃপায় আজ নূরজাহান ভারত-সম্রাজ্ঞী, অকারণে তাঁহার বিরক্তিভাজন হইবার মত নির্ব্বোধ নূরজাহান ছিলেন না, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং এ হত্যাপবাদ তাঁহার শত্রু-পক্ষের মনঃকল্পিত অলীক কাহিনী। ইহার মূলে কোন সত্য ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

খস্রুর হত্যাকাণ্ড দাক্ষিণাত্যে ঘটিয়াছিল; এবং সে সময়ে খস্রু শাহজাদা শাজাহানের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময়ে খস্রুর মৃত্যু হইলে শাজা-হানের উপরে সন্দেহ হইবার কথা, সেই জন্য তাঁহার বিশেষ সতর্ক থাকিবারই সম্ভাবনা। এইরূপ সতর্কতার মধ্যে নূরজাহানের প্রেরিত গুপ্ত হত্যাকারীর কৃতকার্য্য হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য। যে রাত্রে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে রাত্রে শাজাহান কার্য্যান্তরে দূরে ছিলেন, এ সাফাই সাক্ষী সাজাইবারই বা প্রয়োজন কি, তাহাও একটু বিশেষ বিবেচনার বিষয়। রাজকুমার পরভেজ্ মদ্যপায়ী ছিলেন, তাঁহার দীর্ঘজীবনের আশা ছিল না, বস্তুতঃ মদ্যপান করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে খস্রুর মৃত্যু ঘটাইতে পারিলে নূরজাহানের জামাতা

শাহরিয়ারের অপেক্ষা শাজাহানেরই সিংহাসন-অধি-রোহণের পথ পরিষ্কৃত হয়। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে হত্যা করাইয়া নিজে স্বামীর বিরাগভাজন হইয়া শাজাহানের পথ নিষ্কণ্টক করিবার মত বন্ধুতা শাজাহানের সহিত তাঁহার ছিল না; সুতরাং এ হত্যার ষড়যন্ত্রের মূলে আর যেই থাকুক, সম্রাজ্ঞীর এ অপবাদ নিতান্তই অমূলক, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

প্রথম যৌবনে রাজকুমার খস্রু কুমন্ত্রীর পরামর্শে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—পিতা বর্ত্তমানে স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। মহানুভব আকবরের রাজত্বকালে মহারাজ মানসিংহ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজন্যবর্গ ও রাজকর্ম্মচারিগণ জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে খস্রুকে সিংহাসন দিবার গোপন আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর শাহের বুদ্ধি-বলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরের প্ররো-চনায় রাজকুমার পুনরায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত দেখিয়া পরিশেষে আত্মসমর্পণ করেন। তদবধি একরূপ "নজরবন্দী" অবস্থায় রাজকুমারকে সমস্ত জীবন কাটাইতে হয়। অকস্মাৎ যখন শাহজাদা শাজাহানকে দাক্ষিণাত্যে সমরাভিযান করিতে হয়, তিনি উপযাচক হইয়া অগ্রজের রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কেন যান, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ ইতিহাস বলিতে পারে না।

আবিসিনীয়ার সমরকুশল যোদ্ধা বীরবর মালিক-অম্বর দাক্ষিণাত্যে কি উপপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক সকলেই তাহা অবগত আছেন। তাঁহার ন্যায় রণনীতি-বিশারদ সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কি আয়োজন আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বত্রবিজয়ী শাজাহান এ অভিযানেও কৃতকার্য্য হইবার জন্য সমরানুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই রাখেন নাই। এমতাবস্থায় নূরজাহানের প্রেরিত গুপ্তহত্যাকারীর হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে শাজাহানের পক্ষে কঠিন হইত না। রক্ষা করা দূরে থাকুক, যে রাত্রে হতভাগ্য রাজকুমারের ঘাতকহস্তে মৃত্যু হয়, শাজাহান সে রাত্রে ছাউনী ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিলেন কেন, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেন না; সুতরাং এ দুষ্কার্য্যের সন্দেহ যদি কাহারও উপর হওয়া সঙ্গত হয়, তবে ইহা শাজাহানের উপরেই হওয়া উচিত। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনেও সেই সন্দেহই হইয়াছিল; এবং সেই কারণেই তিনি শাজাহানকে ইঙ্গিতে সন্দেহ জানাইবার জন্য, খস্রুর পুত্র বুলাকীকে যৌবরাজ্য দিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইহা শাজাহানের উপর পুত্রশোকাতুর পিতার নীরব

ভৎর্সনা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অনেক ঐতিহাসিক শাজাহানের রাজত্বকালে ইতিহাস লিখিয়াছেন, কেহ বা তাহার পরবর্ত্তী কালে; তাই সমাধিস্থা নারী নূরজাহানের স্কন্ধে তাঁহার অকৃত-কার্য্যের দোষারোপ করিতে কোন দ্বিধাই তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই।

আজ জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীর বাদশাহ জীবিত নাই, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী বিশ্ববিমোহিনী মেহের-উন্নিসা আজ ইহজন্মের স্তুতি-নিন্দার অতীত কোন্ মহৈশ্বর্য্যময় লোক-লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছেন, দিল্লী-দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাকারে আজ আর অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত মুসলমান বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতবর্ষের নীলোজ্জ্বল আকাশ-পটে বর্ণচ্ছটা বিকীরণ করে না, অযুত-দীপাবলি-উদ্ভাসিত, মধুসঙ্গীত-মুখরিত, দিল্লী-রংমহলের রঙ্গমঞ্চ আজ শ্মশান হইয়া গিয়াছে; তাই অলীক অখ্যাতির মলিন পঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য আজ সমবেদনার নয়নসলিলাভিসিঞ্চনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"—মহাকবির এই সারবাক্যের সত্যতা আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিত্য অনুভব করি এবং অপ্রতিবিধেয় বিধানের অমোঘ প্রতাপ অনুদিন মাথায় করিয়া বহন করিয়া থাকি। যাঁহার এক ইঙ্গিতে পলকে প্রলয় হইতে পারিত, আজ তিনি মূকমাতা ধরিত্রীর ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে তাঁহারই অন্ধগর্ভে আশ্রয় লইয়াছেন।



জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান

"গুঞ্জতেথে যিন্‌কে ডঙ্কেসে জমীন ও আসমান্।
চুপ পড়েহেঁ কব্‌র্‌মে, অব্‌ হুঁ না হাঁ। কুচ্‌ভি নহি॥"

যাঁহার দামামারবে হইত কম্পিত ধরণী আকাশ।
সমাধির অন্ধকারে নীরব নিশ্চল (আজি) না বহে নিঃশ্বাস॥

—এই কবিবাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোক সম্বরণ করা আজ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শাজাহান

কাহার ইঙ্গিতে রাজকুমার খস্রুর অকালে অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন, পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের মনে অপরাধী সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই ছিল না। সেই জন্য তিনি ভ্রাতৃদ্রোহী শাজাহানকে কাবুলের বিদ্রোহ-দমনকল্পে রাজ্যের সুদূর উত্তরসীমান্তে পাঠাইবার আদেশ করিলেন। আসল কথা, বৃদ্ধবয়সে ভ্রাতৃহন্তা পুত্রের সাহচর্য্য তাঁহাকে সুখী করিবে না, ইহা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং রাজ্যলোভে যে পুত্র অমানুষিক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাকে স্বেচ্ছায় রাজ্য দিবার সঙ্কল্প হয় ত তাঁহার ছিলও না; তাই কৌশলে সৈন্যবলে বলীয়ান্ সমরকুশল শাজাহানকে দূরে পাঠাইয়া সিংহাসন আর কাহাকেও দিবার কল্পনা হয়ত তাঁহার মনে ছিল। যে সিংহাসনের আকর্ষণ শাজাহানকে ভ্রাতৃরক্তপাতের দুরূহ অপরাধে লিপ্ত করিয়াছিল, সে সিংহাসনের লোভ তিনি হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন কেন? তাই রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কাবুলে অভিযান করিবার ছলে কিয়দ্দূরে পাঞ্জাবে গিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—বাদশাহের

বর্ত্তমান ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া তিনি দূরদেশে যাইতে পারিবেন না। সেই সংবাদ শুনিয়া কাবুল যাইবার জন্য কনিষ্ঠ রাজকুমার শাহরিয়ারের প্রতি আদেশ হইল এবং শাজাহানকে বলা হইল, তিনি সৈন্যভার শাহরিয়ারকে দিয়া অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। বাদশাহের অনভিমতে সিংহাসন পাইতে ইচ্ছা করিলে সৈন্যবল নিজ আয়ত্তে থাকা আবশ্যক, সুতরাং তিনি শাহরিয়ারকে সৈন্যভার না দিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং রাজ্যের নানাস্থানে প্রচার করিতে লাগিলেন যে বৃদ্ধ নরপতি জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে তিনিই এক্ষণে ভারতবর্ষের সম্রাট্।

নিজের শরীরাংশ হইতে যাহার শরীর এবং প্রাণাংশ হইতে যাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার ন্যায় প্রিয় ইহ পৃথিবীতে আর কিছু হইতে পারে কি না, জানি না। সংসারে 'আমার' বলিয়া যদি কাহারও উপর দাবী দাওয়া করা সঙ্গত হয়, তবে স্বীয় সন্তানের উপরেই সে দাবী চলিতে পারে। ভারতের বেদান্ত "অহং" এবং "মম" এই দুই শব্দ অভিধান হইতে বর্জ্জন করিতে বারবার উপদেশ দিয়াছেন; সর্ব্বত্র সে উপদেশ চলিতে পারে, কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে চলে কি না বলা কঠিন। কিন্তু পরম স্নেহভাজন প্রাণের দোসর সেই সন্তান যখন অন্যায় স্বার্থে অন্ধ হইয়া, অবিনয়ের দ্বারা পিতার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ

করিতে প্রয়াস পায়, বা পিতার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য ক্ষুরধার অসি উত্তোলন করিয়া পৈশাচিক ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা দেখায়, তখন তাহার দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের প্রতিবিধান আবশ্যক হইয়া পড়ে; এবং অনিচ্ছায় সাশ্রু-নয়নে আততায়ী পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যও প্রস্তুত হইতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। যে উদয়-পুর বারম্বার মুসলমান সম্রাটের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই, সেই চিরস্মরণীয়, স্বাধীনতার লীলানিকেতন, রাজপুত-বীরত্বের কুরুক্ষেত্র উদয়পুরের পুণ্যশ্লোক রাণা প্রতাপের পুত্রকে শাজাহান দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। রণনীতি-বিশারদ সেনাপতির চিরপ্রার্থিত রঙ্গভূমি দাক্ষিণাত্যের নতোন্নত ভূখণ্ড পুনঃ পুনঃ জয় করিয়া তদ্দেশবাসী বাহুবলদৃপ্ত একাধিক নরপতিকে বশে আনিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের বহু-বিস্তার সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। এ হেন বীররাজ-কুমারকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত সম্রাট্‌কে যুদ্ধের বিপুলায়োজন করিতে হইয়াছিল। মহব্বৎ খাঁর ন্যায় রণপণ্ডিত সেনাপতি তৎকালে ভারতে ছিল কি না সন্দেহ; বাদশাহ তাঁহারই উপর সৈন্যভার দিয়া ব্যাঘ্র-বিক্রম রাজকুমারকে বশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে শাজাহান পরাজিত হইতেছিলেন সত্য, কিন্তু শস্ত্র-পরাজয়ে তাঁহার হৃদয় পরাজয় মানিল না,

পিতার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া, তিনি একস্থানে পরাজিত হইয়া অন্যস্থানে পুনরায় বিদ্রোহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চোরমণ্ডল (করমণ্ডল) উপকূল পর্য্যন্ত মহব্বৎ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে সেই সংবাদ সম্রাটের নিকট পঁহুছিলে, তিনি রাজকুমারের ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের প্রতিভূস্বরূপ শাজাহানের দুই পুত্রকে দিল্লীতে পাঠাইবার আদেশ করিলেন। রণনির্জ্জিত, বিতাড়িত, দৈন্যপ্রপীড়িত, সৈন্যবলবিহীন রাজকুমার গত্যন্তর না দেখিয়া, পিতার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মতি দিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং তৃতীয় পুত্র দারাশেকো ও ঔরঙ্গজেব্‌কে দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রদ্বয়ের বয়ঃক্রম তখন যথাক্রমে চতুর্দ্দশ এবং দশ বৎসর।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসিবার উপলক্ষে সম্রাট্-বংশে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বিবাদ হইয়া অনেক অস্বাভাবিক লোমহর্ষণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রাপ্তবয়স্ক বীরপুরুষের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কাহিনী আমাদের হৃদয়কে পীড়িত করিয়া তুলে সন্দেহ নাই, কিন্তু পিতা পিতামহ জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক লোভ-পরবশ হইয়া দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইলে যদি সংসারানভিজ্ঞ নিরপরাধ

শিশুকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তখন করুণায় আমাদের কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে।

প্রাপ্তবয়স্ক শাজাহান দুর্নিবার লোভপরবশ হইয়া রাজ্যলাভের আশায় পিতার মস্তকোপরি অসি উদ্যত করিয়া, বিশ্বের যাবতীয় পুত্রের নামে অনপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় তাহার প্রায়শ্চিত্তের দুঃসহ ভার তাঁহার শিশু-সন্তানদ্বয়ের উপর পড়িল। "পরাপরাধেন পরাপমানং" প্রবাদের এতদপেক্ষা স্ফুটতর দৃষ্টান্ত সহসা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী শিশু রাজপৌত্র-দ্বয়কে এরূপভাবে রাজধানী প্রবেশ করিতে দেখিয়া দিল্লী নগরীর অধিকাংশ নয়নই শুষ্ক ছিল না, একথা বোধ করি, সাহস করিয়া বলা যায়। আর, কাহার মনে কতদূর আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বলিতে গেলে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই উপলক্ষে আমরা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মাতৃহৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় ইতিহাসে পাইয়াছি। শাজাহানের পিতৃভক্তি ও রাজ-ভক্তির উপর অবিশ্বাস করিয়াই রাজপৌত্রদ্বয়কে পিতা শাজাহানের সদ্ব্যবহারের প্রতিভূ-স্বরূপ আনা হইয়াছিল। পিতার অসদ্ব্যবহারের ফলে শিশুদ্বয়ের কি অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং এই

অভাবনীয় অস্বাভাবিক বিপৎপাতে শাজাহান-মহিষী মম্‌তাজের মনে কি দুর্ব্বিষহ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের স্বভাবকোমল মাতৃহৃদয় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কতদূর ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা জননী না হইলে অপরের বুঝিতে পারা কঠিন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের মহিষী হইয়াই নূরজাহান ভারত-সম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িলে তাঁহাকেও ধূলিশায়িনী হইতে হইবে, তাহা নূরজাহান বিলক্ষণ জানিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে পৌত্রদ্বয়ের উপর বিশেষরূপে স্নেহপ্রীতি না দেখাইলেও লোকে তাঁহাকে বিশেষ নিন্দা করিত কি না সন্দেহ, কিন্তু রাজমহিষীর অন্তর মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া বিচার বিবেচনা করিবার সময় তাঁহাকে দেয় নাই। স্বামীর বিরাগভাজন হইতে হইবে কি না, সে সকল কথা ভাবিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। তিনি মাতৃবক্ষের স্নেহনীড়-বিচ্যুত শাবকদ্বয়কে একেবারে তাঁহার বক্ষে তুলিয়া স্নেহবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ্ করিয়া দিয়াছিলেন।

সচরাচর গৃহস্থের ঘরে পিতামহী পৌত্রকে স্নেহ করিবেন এ কিছু বড় কথা নহে,—না করাই অন্যায় এবং অস্বাভাবিক। কিন্তু দিল্লী-সিংহাসনের আমিষলোলুপ

সিংহ-ব্যাঘ্রের সমরোন্মুখী ভীষণ প্রবৃত্তির বেগ মানব-প্রকৃতিকে কতদূর অধোগামী করিয়াছিল যদি একবার আমরা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে নূরজাহানের এই অপত্যস্নেহকে শ্মশানতলবাহিনী স্রোতস্বিনীর পবিত্রধারা বলিয়া মাথায় স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহব্বৎ খাঁর বিদ্রোহ

যাঁহাকে সাম্রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিতে হয় তাঁহার পদক্ষেপের পথ যেমন সর্ব্বথা কুসুমাস্তীর্ণ হইতে পারে না, তেমনি স্নেহ-দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণও চলে না। কর্ত্তব্যের পথে অটল থাকিয়া রাজধর্ম্ম রক্ষা যাঁহা-দিগকে করিতে হয়, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি হইতেই হইবে।

যে সম্রাজ্ঞীর নারীহৃদয় রাজকুমার শাজাহানের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়ের ভাবী-অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর হইয়া স্নেহপুটের মধ্যে শাবকের ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, সেই করুণার্দ্র হৃদয়খানিই দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর প্রতি বিমুখ হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। বিদ্রোহী রাজকুমার শাজাহানকে সমরে পরাজিত করিয়া সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ নিজকে বাদশাহ জাহা-ঙ্গীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিত্যজ্য জ্ঞানে যখন বাদশাহী হুকুমের বরখেলাপেও কার্য্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না, তখন শাহী-সম্মান রক্ষার্থ সম্রাজ্ঞীর প্রচণ্ড ক্রোধানল মহব্বতের ন্যায় মহাবীরকে ভস্ম করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল।

রাজমর্য্যাদার হানিকর কার্য্য মহব্বতের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মহব্বৎ নিজে কৈফিয়ৎ না দিয়া তাঁহার জামাতাকে পাঠাইয়া দেন; এবং সে কৈফিয়ৎও সম্রাজ্ঞীর নিকট জ্ঞাপন করিতে নহে, প্রসঙ্গাধীন জাহাঙ্গীরকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিয়া সম্রাজ্ঞীর অপ্রচ্ছন্ন অবমাননাই মহব্বতের এইরূপ কার্য্য-প্রণালীর প্রবর্ত্তক। ভারত-সম্রাটের অর্দ্ধাঙ্গিনী, জগজ্জয়ী-জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী, অসামান্যা প্রতিভাশালিনী প্রতাপান্বিতা নূরজাহান অধীন সেনানায়কের এরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার নীরবে সহ্য করিবার পাত্রী ছিলেন না। মোগল-শাসনকালে ইহা অপেক্ষা লঘুতর অপরাধে কত শত লোকের লোমহর্ষণ মৃত্যুর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থিরবুদ্ধিশালিনী নূরজাহান সে প্রকার কোন উদ্ধত আদেশ প্রচার না করিয়া, মহব্বৎ খাঁকে বঙ্গদেশের সুবা হইতে বদলী করিয়া কাবুলে যাই-বার আদেশ প্রচার করিলেন; এবং অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালন করিতে মনোযোগী হইবার জন্য মহব্বৎকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

রাজকুমারের বিদ্রোহ দমন করিয়া স্বীয় শক্তির উপর মহব্বতের আস্থা অপরিসীম বাড়িয়া গিয়াছিল, সেই জন্য তিনি সুবা পরিবর্ত্তনের আদেশ সুস্থচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কর্ম্মস্থান পরিবর্ত্তিত হওয়া এমন

কিছু গুরুতর দণ্ড বা দুঃসহ অপমান নহে ; তথাপি মহব্বতের ন্যায় বিজ্ঞ বহুদর্শী বীরপুরুষ রাজ-আজ্ঞা অবিচারণীয়া বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারিলেন না ; কতকগুলি রাজপুত সৈন্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়া রাজবিদ্রোহী বলিয়া নিজকে ঘোষণা করিয়া দিলেন।

মোগল-শাসনের অধীনে কাবুল অধিক কাল নীরবে থাকিতে পারে নাই। আবহমান-কাল হইতেই মধ্যে মধ্যে রাজশাসনের গণ্ডীর বাহিরে নিজকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া এক-একবার মাথা তুলিয়াছে। বর্ত্তমানেও কাবুলের সেই বৈকারিক লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। শাহজাদা শাজাহান অগত্যা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন ; পিতার প্রতি তাঁহার স্নেহভক্তি কিছুই ছিল না একথা মহব্বৎ জানিতেন। এই মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে মহব্বৎও যদি রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান প্রমাদ গণিবেন, এই আশার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মহব্বৎ তাঁহার চিরাচরিত রাজভক্তির মস্তকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

এই দুঃসংবাদ সম্রাটের নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হয় নাই। জাহাঙ্গীর রাজকার্য্যের সমস্ত ভারই প্রায় সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের উপরে দিয়াছিলেন। যে সকল অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হইত তাহা যদিও নূরজাহানই করিতেন, তথাপি স্থলবিশেষে সম্রাট্‌কে সম্মুখে স্থাপন

করিয়া কাজ করিলে তাহা সহজে সুসম্পন্ন হইত। সুতরাং সময়ে সময়ে রাজ্ঞীর অনুরোধে জাহাঙ্গীর বাদশাহকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্রাম ও ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যের গুরুভার ও কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত। দিল্লী লাহোরের দুঃসহ গ্রীষ্ম সহ্য করা সহজ ব্যাপার নহে, সেই জন্য জাহাঙ্গীর শাহ প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের পূর্ব্বে বহু সৈন্য-সামন্ত সহচর সমভিব্যাহারে ফলপুষ্প-সমাকীর্ণ হিমপ্রপাত-শীতল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন কাশ্মীরের শৈলনিবাসের উদ্দেশে যাত্রা করিতেন।

চতুর্দ্দিক হইতে বিপৎপাতের সংবাদ আসিতে লাগিল দেখিয়া, বিশেষতঃ কাবুলের বিদ্রোহ-সংবাদে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া নূরজাহান, বাদশাহকে কাশ্মীরের পথে একবার কাবুলে পদার্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন,— বাদশাহের শুভাগমনে অচিরকাল মধ্যে কাবুলে শান্তি-স্থাপন হইবার পর তিনি হৈমনিবাসে গ্রীষ্মযাপন করিলে, সাম্রাজ্যের কোন হানি হইবার সম্ভাবনা আর থাকিবে না।

প্রাণপ্রিয়া মেহের-উন্নিসার ইচ্ছা জাহাঙ্গীরের নিকট কোরাণের আজ্ঞা অপেক্ষাও বলবতী; এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাজ্ঞীর অভিপ্রেত প্রস্তাব রাজ্যের মঙ্গলসূচক বিবেচনায় বাদশাহ বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বিধাহীন-চিত্তে

কাবুল-যাত্রার অভিমত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করতঃ উদ্যোগ অনুষ্ঠানের আদেশ প্রচার করিলেন। পদানত প্রজার আন্তরিক রাজভক্তি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে এ অভিযান নহে, প্রয়োজন হইলে এই অভিযানকেই সমরাভিযানে পরিণত করিতে হইবে, বিশেষতঃ মহব্বতের ন্যায় বাহুবলদৃপ্ত রণপণ্ডিত সেনাপতির বিদ্রোহাচরণ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে নাই এমন কথা বলা যায় না। এই সকল কারণে কাশ্মীর-যাত্রার সুবিপুল উদ্যোগ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে তাঁহাদের অধীন শক্ত সমরাভিজ্ঞ রণনিপুণ সেনাদলকে সঙ্গে লইবার আদেশ দেওয়া হইল। মন্ত্রী আসফ খাঁ হইতে ক্ষুদ্রতম ওমরাহ পর্য্যন্ত সকলকেই সঙ্গে যাইবার আজ্ঞা প্রচার করা হইল। ফলতঃ হয়-হস্তি-রথ-পদাতিক-সমন্বিত চতুরঙ্গ-বাহিনী সজ্জিত করিয়া, ভুবনবিখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ শরীর-রক্ষক আহুদি সেনাদলে পরিবৃত হইয়া, বিপুল আড়ম্বরে দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রাণসমা মহিষী মেহের-উন্নিসার সঙ্গে কাবুলের পথে যাত্রা করিলেন।

শাহীসৈন্য কাবুলের পথে কুচ্ করিয়া ধীরে ধীরে চলিল ; এ দিকে মহব্বৎ খাঁ তাঁহার অল্পসংখ্যক রাজপুত সেনা লইয়া বাদশাহী পথের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমোদপ্রিয় জাহাঙ্গীর শাহের

কর্ত্তৃত্বের সময়ে অনেকে অনেক অপকার্য্য করিয়া বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়া গিয়াছে ; সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কাহাকেও সেরূপ প্রশ্রয় দেন নাই, সেই জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই নূরজাহানকে অত্যাচারিণী মনে করিত। সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ নিজকে নিরপরাধে দণ্ডিত মনে করিলেন ; এবং সে দণ্ডের মূল কারণ নূরজাহান বেগমের স্বেচ্ছাচারিতা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। মহব্বৎ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন ; সম্রাজ্ঞী সে প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে কাবুলের কার্য্যভার লইতে আদেশ দেন। জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মহব্বৎকে সম্রাজ্ঞীর স্বেচ্ছাচারিতায় কাবুল যাইতে হইত না তাঁহার বিশ্বাস, এবং পথিমধ্যে যাহাতে বাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেই চেষ্টায় সেনাপতি সসৈন্যে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সে সুযোগও আসিল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সসৈন্যে রাত্রিযাপনের জন্য বিতস্তা-তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময়ে সেতু-সাহায্যে বিশাল বাহিনী নদীর অপর পারে লইয়া যাইবার আদেশ সৈন্যাধ্যক্ষের উপর দিয়া স্বয়ং বিশ্রামার্থ স্বীয় পটমণ্ডপে রজনী-যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যূষে বাদশাহী

সুবিশাল চতুরঙ্গ-বাহিনী নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হইলে বাদশাহ যথাকালে পার হইবেন, এই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নারী হইলেও মোগলরমণী, বিশেষতঃ সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্যের রশ্মি নিজহস্তে ধারণ করার কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। শাহীসৈন্য নির্ব্বিঘ্নে সেতু পার হইয়া শৃঙ্খলায় পরপারে পহুঁছিতে পারে, সে ব্যবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন বলিয়া হস্তিপৃষ্ঠে তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সমস্ত সৈন্য অপরপারে পহুঁ-ছিলে, তিনিও পার হইয়া বাদশাহের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; সম্রাটের দেহ ও শিবির-রক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক সেনামাত্র পূর্ব্বপারে রহিল।

মহববৎ খাঁ এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। যখন অল্পসংখ্যক সেনা মাত্র বাদশাহের নিকট রহিল দেখিলেন, তখন হঠাৎ সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন, এবং বাদশাহী সেনা ফিরিয়া আসিতে না পারে সেই জন্য সেতুবন্ধ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রণরঙ্গিণী মেহের

বিতস্তানদীর অপর পারে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া সম্রাজ্ঞী এই ভীষণ দুর্দ্দৈব দেখিতে পাইয়াছিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ বাদশাহের উদ্ধারকল্পে আপন সেনা-নায়কদিগকে সসৈন্যে সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবার আদেশ দিলেন।

খরস্রোতা বিতস্তা সন্তরণে পার হওয়া একরূপ মানবসাধ্যের অতীত। মন্ত্রী এবং ভ্রাতা আসফ খাঁ পর্য্যন্ত যখন পশ্চাৎপদ হইলেন, তখন এই অপূর্ব্ব মোগলরমণী, বাদশাহের জীবিতরূপিণী নারীশিরোমণি নূরজাহান স্বয়ং সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় হস্তিসহ মাহুতকে সন্তরণে নদী পার হইবার আদেশ দিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাদনুসরণের জন্য বারম্বার উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সেই হস্তীতে সম্রাজ্ঞীর শিশু দৌহিত্রীও মাতামহীর স্নেহক্রোড়ে বসিয়া ছিল, কিন্তু স্বামীর উদ্ধার মানসে পতিগতপ্রাণার একাগ্রতা অন্য কোন দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর তাঁহাকে দেয় নাই।

হস্তিপৃষ্ঠ-সমারূঢ়া, নানা-প্রহরণধারিণী, রণোন্মাদিনী রূপসী রমণীর পতি-উদ্ধারকল্পে প্রাণান্ত উদ্যম যে কি পরম উপাদেয় এবং জগতের ইতিহাসে কত বিরল,

তাহা ইতিহাসজ্ঞেরাই অবগত আছেন। এই ঘটনা ভারতবর্ষে না হইয়া যদি জগতের অন্য কোন স্থানে সংঘটিত হইত, তবে এই অত্যাশ্চর্য্য পতিপ্রেম ও অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী কবি-কল্পনায় স্থান পাইয়া কাব্য-জগতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিত। যুগযুগান্তের অতীত ভারতবর্ষে শিব-সাধনার অপূর্ব্ব শক্তিবলে মণিপুর-রাজপুরীতে এক বীরকন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার বিপুল কীর্ত্তির উপাদেয় গাথা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি অমৃতকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। সমুদ্র-সৈকতে, রেবতাচলের পাদমূলে দৃপ্ত যাদবসৈন্যের প্রতি-কূলে, বসুদেব-নন্দিনীর অপূর্ব্ব অশ্বচালনার অদ্ভুত কাহিনী * অমর কবি কাশীদাসের কল্পনায় স্থানলাভ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। পাঠান ভূপতি আল্‌তামাস-দুহিতার অপরূপ কাহিনী ইতিহাস আজও গাহিতেছে; কিন্তু দয়িত-দুর্গতির অপনোদনকল্পে খরতোয়া বর্ষা-তরঙ্গিণীর ঊর্ম্মিচঞ্চল প্রসারিত বক্ষে পতিগতপ্রাণার সসৈন্য ঝম্পপ্রদানের অপূর্ব্ব কথা আমরা তিনশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি!

রাজমহিষীর আদেশে উন্মত্ত নদীতরঙ্গে উন্মাদের ন্যায় হস্তিসহ ঝাঁপ দিয়া পড়িতে মাহুত ইতস্ততঃ করিতে-

* এ কাহিনী মূল মহাভারতে নাই।

ছিল। ভাবিয়াছিল, একটু সময় অতিবাহিত হইলে হয়ত সম্রাজ্ঞী তাঁহার অসমীচীন আদেশ প্রত্যাহরণ করিয়া লইবেন। হায়, নির্ব্বোধ হস্তিচালক বুঝে নাই যে, যাহার সর্ব্বস্ব পরপারে বিপদ্‌গত, নিজের মঙ্গলামঙ্গল দেখিবার তাহার আর সময় নাই। নদী-স্রোত ত তুচ্ছ কথা, প্রয়োজন হইলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেও ঝাঁপ দিয়া পড়িতে মেহেরের মনে কোন দ্বিধাই আসিত না।

অনুদ্ভিন্ন-যৌবন কিশোরকালে যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে, পরিপূর্ণ যৌবনে যাঁহার অনুধ্যানে দিন কাটিয়া গিয়াছে, প্রৌঢ়ের প্রাক্কালে যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মেহেরের নারীজন্মের সকল সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে, যাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রসাদাৎ মেহের মহেন্দ্র-বাঞ্ছিত ভারতসিংহাসনের একাধীশ্বরী, সেই চিরারাধ্য, চিরবাঞ্ছিত, চিরকামনার সামগ্রী ভারতভাগ্য-বিধাতা জাহাঙ্গীর নদীর অপরপারে দীন নিরুপায় ভাবে শত্রুহস্তে নিপতিত, আর মেহের-উন্নিসা কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত হইয়া পরপারে আপন মঙ্গলচিন্তা করিবে? নারীদেহ ধারণ করিয়া, প্রেম-দেবতার মোহনাঙ্গুলি-স্পর্শে যাহার হৃদি-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে তাহা পারে কিনা জানি না—বোধ হয় না।

সম্রাজ্ঞীর কঠোর আদেশ বহুক্ষণ অমান্য করিবার শক্তি মাহুতের ছিল না। বারম্বার আদিষ্ট হইয়া গত্যন্তর-বিরহিত চালক, ঈশ্বরের নাম লইয়া সম্রাজ্ঞী-সহ বিপুলকায় রণহস্তীকে নদীস্রোতের মধ্যে নামাইয়া দিল।

রাজমহিষী দুস্তর নদী হস্তিপৃষ্ঠে পার হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন দেখিয়া প্রভুপরায়ণ বাদশাহী সেনা রাজেন্দ্রাণীর শরীর-রক্ষার্থ উন্মাদ-তরঙ্গসঙ্কুল নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সম্রাজ্ঞীর এই দুঃসাহস এবং শাহীসৈন্যের এই অপরিসীম প্রভুভক্তি দেখিয়া মহব্বৎ খাঁ এবং তাঁহার অধীন রাজপুত সৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত, নিমেষহত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ছয়শত অশ্বারোহিসৈন্যের মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার ইতিহাস রাজকবির অমৃতনিষ্যন্দি-লেখনীর মুখে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বীর্য্যবতী মোগল রমণীর এবং অগণিত মোগল সৈন্যের মৃত্যুসাগর-সন্তরণের অপূর্ব্ব কাহিনী গাহিবার কবি ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও জন্মে নাই, —এ কি দুরদৃষ্ট !

ক্ষণকালের জন্য রাজপুতগণ স্তব্ধ ছিল বটে, কিন্তু

পরমুহূর্ত্তেই মহব্বতের আদেশে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় তীর ও গুলিবর্ষণ চলিতে লাগিল। রাজমহিষীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; বাদশাহকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া তিনি সম্মুখ দিকেই ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অপর পারে প্রায় পঁহুছিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার হস্তী শুণ্ডে বিষম আঘাত পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং মাহুতের আয়ত্তের অতীত হইয়া গভীর জলের তীব্র স্রোতে তৃণবৎ ভাসিয়া চলিল। ভারতীয় যুদ্ধ-রীতি চিরকালই একরূপ; সৈন্যভার যে গ্রহণ করে, তাহার কোনরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিলেই সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়;—এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—রাজেন্দ্রাণীর স্বামি-উদ্ধার-সঙ্কল্প শত চেষ্টার পরেও এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাকে ব্যর্থ হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাহৃত মৃত্যুদণ্ড

গত্যন্তরবিহীনা মেহের-উন্নিসা অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর দুঃখ দুর্দ্দৈবের সমানাংশ ভাগ করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং ভ্রাতা আসফ খাঁ প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধ নিষেধ না শুনিয়া মহব্বতের নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ স্বামীর শত্রুকারানিবাসের সমানাংশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন।

অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী রাজমহিষী যখন দেখিলেন যে বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল না, তখন কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদয় হইল; এবং মহব্বতের আয়ত্তের মধ্যে বসিয়াই স্বামীর উদ্ধারকল্পে নিজমনে উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রতি মহব্বতের কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাঁহার বিশ্বাস সম্রাজ্ঞী নূরজাহানই তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন; সুতরাং বাদশাহকে নিজ আয়ত্তে পাইয়াও তাঁহার রাজোচিত সম্মান রক্ষা বিষয়ে মহব্বতের কোন ত্রুটি হয় নাই। বাদশাহের ইচ্ছামত মৃগয়া, ভ্রমণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য চলিতে লাগিল; কেবল সর্ব্বদা মহব্বতের নিযুক্ত সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে

ঘেরিয়া রাখা হইত,—তিনি আয়ত্তের বাহির হইয়া না যাইতে পারেন।

মহব্বৎ খাঁর মনে দৃঢ়প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান উচ্চাভিলাষিণী রমণী, ক্ষমতার পরিচালনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে বিলাসের স্রোতে নিমজ্জিত রাখিয়া নিজে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার উৎপাতে প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মপরায়ণ মহামতি আকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যকে তিনি অচিরকাল মধ্যে শ্মশানে পরিণত করিবেন। মহব্বৎ খাঁ বাদশাহকে স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে সম্রাজ্ঞীর প্রতি বীতরাগ করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন; এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, সেনাপতি মহব্বতের সে উদ্দেশ্য পূর্ণও হইয়াছিল।

কাব্য-কথায় পড়িয়াছি, সূর্য্যবংশের লোকোত্তর নরপতি পুণ্যশ্লোক শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও চিত্তবিভ্রমের হাত হইতে রক্ষা পান নাই; দুর্ম্মুখের কুৎসা-কথায় কর্ণপাত করিয়া তিনি লোকরঞ্জনার্থ লক্ষ্মীরূপিণী জনকনন্দিনীর ব্যভিচার কল্পনা করিয়া সতীশিরোমণি পূর্ণগর্ভা জানকীর নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! "স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি

বা জানকীমপি”—কবি-বিরচিত এই শ্লোকার্দ্ধের মধ্যে “যদি বা” এবং “অপি” শব্দের দ্বারা রামচন্দ্রের অপার প্রেম সূচিত হইলেও, ভ্রমাত্মক লোকরঞ্জনাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে নিরপরাধা অন্তঃসত্ত্বা সাধ্বীর গুরুদণ্ড বিধান করিয়া তিনি যুগযুগান্তস্থায়ী অনপনেয় কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিমল-বিপুল-বুদ্ধি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সনাতন মহাপুরুষের যদি চিত্তবিভ্রম সম্ভব হইয়া থাকে, তবে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ জাহাঙ্গীরের মনুষ্যবুদ্ধি ঘটনাধীন বিমলিন হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই বটে, কিন্তু সুবিশাল ভারতবর্ষের ত্রিংশৎ কোটি নরনারীর ভাগ্যবিধাতা যিনি, তাঁহার অমানুষিক চিত্তদৌর্ব্বল্য দেখিলে অন্তরে বড় ব্যথিত হইতে হয়।

সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ জাহাঙ্গীর শাহের দরবারে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, পরপীড়ন, মর্য্যাদাশীল ব্যক্তির অবমাননা প্রভৃতি কয়েকটি দোষ উল্লেখ করিয়া অভিযোগ আনয়ন করেন; এবং জাহাঙ্গীরের বিচারে সম্রাজ্ঞীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচারিত হয়।

ইতিহাসের এই অংশ পাঠ করিয়া লজ্জিত, ভীত ও স্তম্ভিত না হইয়াছেন এমন লোক অতি বিরল। যে নূরজাহান যৌবন-সমাগমের প্রথম হইতে আমরণ

তাহার সমগ্র নারী-হৃদয়ের সমুদয় স্নেহপ্রীতি জাহাঙ্গীরের পদতলে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, যে নূরজাহান প্রাণ-প্রিয় জাহাঙ্গীরের মদিরাসক্তি কম করিতে গিয়া বাদ-শাহের হস্তের লাঞ্ছনা পর্য্যন্ত হাস্যমুখেই বহন করিয়াছে, জাহাঙ্গীরের দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিতপ্রায় রাজদণ্ড নিজে বহন করিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি যে নূরজাহান করিয়া দিয়াছে, শত্রুকবলিত স্বামীকে উদ্ধার করিবার মানসে যে নূরজাহান দ্বিধাবিহীন চিত্তে মৃত্যুসাগরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, স্বামি-সঙ্গ-লাভের জন্য মহব্বতের লৌহশৃঙ্খল যে নূরজাহান স্বেচ্ছায় গলায় পরিয়াছে, তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কেমন করিয়া জাহাঙ্গীর শাহ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের বুদ্ধির অগম্য।

নিরপরাধা পতিগতপ্রাণার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা তাঁহার নিকট পঁহুছিলে নূরজাহান অসামান্য চিত্তবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিয়াও সম্রাজ্ঞী প্রাকৃত রমণীর ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই; একটিবার মাত্র বলিয়াছিলেন—"যে বাদশাহ স্বয়ংই অপরের বন্দী, অন্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিবার তাঁহার অধিকার আছে কিনা বলা কঠিন; প্রজা-সাধারণরূপে আমাকে গণ্য করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ তিনি দিলে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে আদেশ

আইনসঙ্গত হইবে না। তবে আমি তাঁহার স্ত্রী; স্বামী-রূপে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতারূপে, আমার সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এবং সে অধিকার আমি মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলাম। কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আমার চিরারাধ্য দেবতার চরণবন্দনার আদেশ প্রার্থনা করি; এবং যে হস্তে আমার ভাগ্যবিধাতা আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে হস্তে আজ আমার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন, সেই রাজহস্তের উপরে আমার ইহপৃথিবীর শেষ চুম্বনটি রাখিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজাধিরাজের প্রিয়তমা মহিষী যখন তাঁহার প্রাণাধিক পতি-দেবতার নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন, দম্পতীর সেই মিলন-মুহূর্ত্তের করুণা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সামগ্রী নহে। হৃদয়বান্ পাঠক তাঁহার কল্পনানেত্র উন্মীলিত করিয়া সেই মৃত্যু-মুহূর্ত্তের পরম করুণার আলেখ্য দেখিবার চেষ্টা করিলে, নয়নজলে বারবার তাঁহার বাহ্যচক্ষুর দৃষ্টি লোপ হইয়া যাইবে।

রাজাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল, প্রাচ্য রমণীর শিরোভূষণ নূরজাহানকে মরিতে হয় নাই; কিন্তু তাহা রাজরাজেন্দ্রের কৃপায় নহে। পতিনির্দেশ মাথায় করিয়া

অপূর্ব্ব সুন্দরী মেহের-উন্নিসা অবিকম্পিত পদে মৃত্যুর অন্ধকারময় অজ্ঞাত পথে ভয়লেশশূন্য হইয়া যাত্রা করিয়াছেন দেখিয়া সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর পৌরুষপূর্ণ বীরহৃদয় বিচলিত হইয়াছিল ; তাই মেহেরের মুকুটমণ্ডিত মস্তক এ যাত্রা ঘাতকের খড়্গাঘাতে ধূলিলুন্ঠিত হইতে পারে নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সম্রাজ্ঞীর কূটনীতি

মহাবীর মহব্বতের মহত্ত্বে সম্রাজ্ঞী মেহের-উন্নিসার মস্তক রক্ষা হইল, কিন্তু সমগ্র ভারতের অধীশ্বর জাহাঙ্গীর শাহের প্রাণসমা পত্নীর আজিকার দিনের মনোভাব মানব-মনস্তত্ত্ববিদের চিন্তনীয় বিষয়।

যাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ লোক প্রাণ দিয়াছে এবং পাইয়াছে, যাঁহার ঈষৎ কৃপা অকৃপার কটাক্ষে মহব্বতের ন্যায় অগণ্য লোকের পতন অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছে, সমগ্র ভারত যাঁহার সিংহাসন-তলে যোড়করে নতমস্তকে আজ্ঞার অপেক্ষায় সতত সন্ত্রস্ত থাকিত, আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার পরপ্রসাদে প্রাণরক্ষা হইলে সে প্রাণ যে বক্ষপঞ্জরের মধ্যে কেমন করিয়া কাতর হয়, তাহা যাহার হইয়াছে সেই জানে। "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে"—ভগবানের এই মহাবাণী বোধ করি এই সকল স্থানেই প্রযোজ্য।

এই মরণাধিক অপমানের প্রতিশোধের জন্য সম্রাজ্ঞীর অধীরতা অনেক ঐতিহাসিক অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া বহু আড়ম্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, পথপ্রান্ত-পতিত

ঘৃণ্য সরীসৃপও পদদলিত হইলে দংশনোদ্যত হয়, গৃহপালিত মার্জ্জারও আক্রান্ত হইলে তাহার শক্তি-সাধ্য অনুসারে প্রতিশোধ লইবার উদ্যম করে! উন্মুক্ত দিবালোকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিশোধের পন্থা থাকিতে যদি কেহ অন্ধকার পথের অন্বেষণ করে, তবে তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কারারুদ্ধা সম্রাজ্ঞী যদি নিজের ও স্বামীর উদ্ধার-কল্পে গোপন পথ অনুসরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিন্দনীয় বলিতে পারিলাম না। ভারত-সম্রাজ্ঞী পরাধীনতার দুঃসহ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যে কোন পথই কেন অবলম্বন করুন না, তাহা দূষণীয় নহে এবং সাধারণ নীতির পথ হইতে রাজনীতির পথ একটু স্বতন্ত্র, একথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বকালে ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্বে মহাপদ্ম নন্দের সবংশে নিধন সম্ভব হইয়াছে, সেখানে নূরজাহানের অনুষ্ঠিত উদ্ধারের উপায়কে দূষণীয় দুর্নীতি বলিতে পারা যায় না।

সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ কারণবশতঃ সম্রাজ্ঞীর প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; প্রতিহিংসার উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে পথমধ্যে বাদশাহকে কৌশলে বন্দী করিয়া নিজ আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া তাঁহার দ্বারা সম্রাজ্ঞীর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কেমন করিয়া স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। যে নারী বন্দী স্বামীর সান্নিধ্য

কামনা করিয়া স্বেচ্ছায় স্বয়ং শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহার বধের নিমিত্ত মহব্বতের ন্যায় বীর-পুরুষ যদি হীন কৌশল অবলম্বন করেন, তবে সেই পরম শত্রুর বধকল্পে নূরজাহানের কোন পন্থা-অবলম্বনই নিন্দনীয় বলা যায় না। পুরুষ হইয়া, বীরপুরুষ হইয়া, যদি মহব্বৎ খাঁ নারীহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে সঙ্কোচ বোধ না করিয়া থাকেন, তবে সেরূপ শত্রুর বধের নিমিত্ত সম্রাজ্ঞীর কৌশলময় পন্থা-অবলম্বন দূষণীয় বলা কঠিন।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই সম্রাজ্ঞীর হস্তে রাজকার্য্যের ভার দিয়া জীবনের অপরাহ্নে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমানে যত কিছু অনুষ্ঠানের সুযোগ এবং উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক, তাহা সম্রাজ্ঞীকেই করিতে হইয়াছে। মহব্বতের কৃপায় একবার জীবন রক্ষা হইয়াছে বলিয়া সেরূপ শত্রুকে বিশ্বাস করা কঠিন ; সময়ান্তরে আরও কত কি অনর্থপাত মহব্বতের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, এই জ্ঞানে সম্রাজ্ঞী তাঁহার ধ্বংসের জন্য যদি গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া থাকেন, তবে রাজনীতির দিক হইতে দেখিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজাসনে বসিয়া সব সময়ে সামান্যনীতির অনুসরণে কার্য্য করা যায় না ; করিলে, রাজকার্য্যের ক্ষতি অনিবার্য্য এবং রাজ্যে শৃঙ্খলারক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়ে ; দুষ্টের দমন সব সময়ে সম্ভব হয় না।

মহব্বতের বীর্য্যবত্তা ও রণকৌশলে শাহীসৈন্য তাঁহার বশীভূত, বিশেষতঃ ঐ সেনার অধিনায়কত্ব মহব্বৎ বহুদিন করিয়াছেন ; সুতরাং সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়া স্বামীর উদ্ধার নূরজাহানের পক্ষে অসম্ভব দুরাশা, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বাদশাহের শরীর-রক্ষক সৈন্যগুলি পর্য্যন্ত মহব্বতের নির্ব্বাচিত, তাঁহার দাসদাসীগুলিও মহব্বতেরই অনুগত ; সুতরাং বাদশাহকে উদ্ধার করিবার সমস্ত সহজ পথগুলি সম্রাজ্ঞীকে কোন ছিদ্রই দেয় নাই। তখন সম্রাজ্ঞীর মনে হইয়াছে যে মহব্বৎ সমস্ত অনর্থের মূল ; তাহাকে গোপন উপায়ে হত্যা করাইতে পারিলে সব পাপের শান্তি হইবে।

সম্রাজ্ঞীকে এই নরহত্যার পথ মহব্বতই দেখাইয়াছিলেন। তিনি যদি স্বীয় আয়ত্ত্বাধীন সম্রাটের দ্বারা বিচারের ছলনায় নারীহত্যার অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে হয়ত নূরজাহানের মনে এই বিগর্হিত পন্থা অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হইত না। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন নূরজাহানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বিশ্রামসুখ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, সেইদিন হইতে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এরূপ গোপন নরহত্যার অনুষ্ঠান তাঁহাকে আর করিতে দেখা যায় নাই ; সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই এই বিগর্হিত পন্থানুসরণ তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল ;

ইহা তাঁহার দুষ্ট প্রকৃতির আনন্দকর অনুষ্ঠান নহে।

যে বাদশাহের কৃপায় মহব্বৎ মহব্বৎ, যাঁহার অনুগ্রহে শাহীসেনার অধিনায়ক হইয়া মহব্বৎ ভারতত্রাস, যাঁহার করুণায় সুবার ভার প্রাপ্ত হইয়া মহব্বৎ দেশপূজ্য ওমরাহ, যাঁহার অনুকম্পায় নির্ধন মহব্বৎ আজ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—সেই বাদশাহের অজ্ঞাতসারে, তাঁহারই নামে রাজ্যশাসনের ছল করিয়া নিরীহ কাবুলবাসী আফগানদিগের উপর যে অমানুষিক লোমহর্ষণ অত্যাচার মহব্বৎ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে বর্ণিত সে ব্যাপার একবার মানসনয়নে দেখিলে, মানুষকে স্তম্ভিত হইতে হয়। লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহদাহ, রমণীর প্রতি অত্যাচার—এই সকল বীভৎস ব্যাপার মহব্বতের আজ্ঞায় যখন অব্যাঘাতে চলিতেছিল, যখন নিরীহ নগরবাসী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সন্নিধানে আসিয়া প্রতীকারের ব্যর্থ আবেদন জানাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিল, তখনই কাবুলী হত্যাকারী নিযুক্ত করিয়া সম্রাজ্ঞী মহব্বতের জীবন-নাশের চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছিলেন; নিরীহ নাগরিকদিগের উপর অত্যাচার বন্ধ করাও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে, যদিও ইতিহাস তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নাই। তাহা না হইলেও, কেবল স্বামী এবং নিজের উদ্ধারের জন্য উপায়ান্তর না

দেখিয়া যদি ঐ পথ অবলম্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু নূরজাহানের ন্যায় অবস্থাপন্না ভারত-সম্রাজ্ঞীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

যৌবনের প্রথম প্রারম্ভে সংসার যখন বিচিত্র বর্ণে গন্ধে স্পর্শে চক্ষের সম্মুখে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, অন্তরের মধূচ্ছ্বাসে মন যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, জীবনের সেই মাহেন্দ্রলগ্নে ঈষদুদ্ভিন্নদল হৃদয়শত-দলের উপর যাঁহার রাতুল চরণ স্থাপন করিয়াছি, তাহার পর নানা সুখদুঃখ হর্ষশোকের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে জীবনপথে অগ্রসর হইবার সময়ে অপার স্নেহের সহিত যাঁহার চিন্তা না করিয়া দিনেকের জন্যও জলগ্রহণ করি নাই, যাঁহার স্নেহের অভয়-আশ্বাসের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করিয়া জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় গঠন করিবার বিপুল আশায় তাঁহারই চরণে শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, জীবনের আসন্ন সন্ধ্যার শান্তিপর্ব্বে যাঁহার স্নেহনীড়ের মধ্যে কল্যাণময় আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে নয়নের শেষ নিমেষপাত হইয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম, নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব নিঃসহায় অবস্থায়, পথের ধূলির উপর নিতান্ত দীনভাবে দিনযাপন করিতে দেখিয়া যাঁহাকে স্নেহের সাহচর্য্য দিবার জন্য শত্রুহস্তে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছি, হৃদয়ের এমন বল্লভতম ব্যক্তির জন্য নারীর অনা-চরণীয় অধর্ম্ম জগতে কিছু আছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

নূরজাহান তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমের জন্য এই লোকগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া, উদাসীনের মত নির্লিপ্ত থাকিয়া লৌকিক শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মাচরণ করিলে হয়ত সমাজে অধিকতর প্রশংসার পাত্রী হইয়া ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আজীবন-পরিপোষিত যে অপার স্নেহ-সম্পদ সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, প্রাণপ্রতিম রাজ-কান্তের নিকট হইতে তাহার যে প্রতিদান তিনি পাইয়া-ছিলেন, সেই স্নেহসম্বন্ধের সম্মুখে তাঁহার ভবিষ্যৎ সুনাম দুর্ণাম তিনি তুচ্ছবোধ করিয়াছেন। যে স্নেহ মমতার মোহে সমাচ্ছন্ন হৃদয় লইয়া আমরা সংসারে জন্মলাভ করি, যে স্নেহের ভিখারী হইয়া আমরা সমগ্র জীবনের প্রত্যেক পলে বিপলে স্নেহাস্পদের পদতলে হৃদয়কে লুণ্ঠিত করিয়া ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে যদি অন্তরের শূন্য ভিক্ষাপাত্র স্নেহের সুবর্ণ-সম্পদের দক্ষিণ-দানে ভরিয়া উঠে, তবে সেই প্রেমসম্পদ-দাতার তৃপ্তি এবং তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত আমাদের সুকর দুষ্কর কিছুই নাই; এবং ভবিষ্যৎ বিচারক সম্প্রদায়ের প্রসাদ প্রসন্নতার দিকে দৃকপাত করিবার আমাদের প্রবৃত্তি এবং অবসর কোথায়? আর বিচার করিবেই বা কে? আমরা সকলেই মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন; বিশ্বের আদিম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত তৃষ্ণাতুর হৃদয় লইয়া

সকলেই অমৃতোপম প্রেম-নির্ঝরের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছি। প্রিয়-বিরহ অপ্রিয়-সম্মিলনের দারুণ দুঃখে বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাতর হৃদয়ের হাহাকার অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে এবং চলিবে। সৌভাগ্যের ফলে যদি কেহ এই চিরন্তন দাবদাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে, তৃষ্ণাতুর হৃদয়ের চিরাকাঙ্ক্ষিত অমৃত-তর্পণ তাহার সব জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, তবে অন্যে তাহার তদানুসঙ্গিক সুকৃত দুষ্কৃতের বিচার করিবার অধিকারী নহে। আমরা সকলেই যে মায়া-মোহে অন্ধ, কে কাহার বিচার করে? যে ঘটনা আমার সম্বন্ধে ঘটিলে তাহার অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া আনি, তাহাকে সমর্থন করিবার যত্ন করি,—অপরের সম্বন্ধে অবিকল সেই বিষয়ই আমার চক্ষুশূল হইয়া উঠে; শত প্রকারের বিরোধী তর্কদ্বারা লক্ষ দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাকে এবং তাহার কর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইবার জন্য আমরা প্রাণপাত যত্নের ত্রুটি করি না! মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারক তিনিই, যিনি হর্ষামর্ষ-বিরহিত, মোহাতীত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। অন্য সকলের বিচার দ্বেষে দুষ্ট, হিংসায় হেয়, পরশ্রী-কাতরতায় পরিম্লান এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

গোপন হত্যাকারীদ্বারা মহব্বৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট

সংঘটন হইতে পারে নাই। তিনি সসৈন্যে কাবুলে প্রবেশ না করিয়া তথাকার রাজধানীর তোরণদ্বার হইতেই ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়া বাদশাহী সেনার শিবিরভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য কুচ্ করিবার আদেশ দিলেন।

পথমধ্যে তাঁহার নানাবিধ চিন্তা উপস্থিত হইল। আজীবন সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে রাজ্যভার স্বয়ং লইতে হয়। যে স্বয়ং বা তাহার বংশের কেহ কোনদিন রাজ্যচালনা করে নাই, হঠাৎ একদিনে তাহার স্কন্ধে সাম্রাজ্যের ভার পড়িলে, সে ভার বড় গুরু বলিয়া মনে হয়; তাহার উপর নূরজাহানের ন্যায় বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞীকে চিরকাল এইভাবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হইবে কি না, সে চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। পথমধ্যে সম্রাট্‌কে হস্তগত করা হইয়াছিল; সেখানে সঙ্গীয় সেনা এবং সেনানায়কগণ ব্যতীত অন্য কোন আমীর ওমরাহ বা সামন্তরাজগণ মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিলেন না; রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে মহব্বতের এই দুর্বিনীত ব্যবহার রাজ্যের ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ এবং সামন্তরাজগণ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, মহব্বৎ সিংহাসনে বসিতে চাহিলে তাহা সম্ভব হইবে কি না, কাবুলের নিকট গুপ্তহত্যাকারীর চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া, রাজধানীতে তাঁহার প্রকাশ্য হত্যা

অসম্ভবই যে হইবে, কে বলিল! এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, অনিশ্চিত আপদের আশঙ্কা মাথায় করিয়া বহন করা অপেক্ষা, নিশ্চিত নিরাপদকে বরণ করিয়া লওয়াই সঙ্গত। সেই সঙ্কল্প স্থির করিয়া একদিন প্রভাতে সম্রাট্-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং রাজ-পদতলে তাঁহার তরবারি রাখিয়া বিগত ব্যবহারের নিমিত্ত শাস্তিগ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিলেন। সহসা সম্রাটের পক্ষে মহব্বতের এ ব্যবহার বিশ্বাস করা কঠিন হইয়াছিল; কিন্তু যখন বুঝিলেন মহব্বৎ অন্তরের সহিত প্রভুত্ব ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং বিগত দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য তিনি অনুতপ্ত, তখন সর্ব্বাত্মায় তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া নিজের মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করেন নাই।

সম্রাটের নিকট তিনি ক্ষমা পাইলেন বটে, কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার প্রচুর সন্দেহই ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, সম্রাজ্ঞী মহব্বৎকে মার্জ্জনা করেন নাই; এবং সেই উপলক্ষে নূরজাহানের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন

নাই। বাদশাহের পক্ষে মহব্বৎকে ক্ষমা করা কঠিন নহে, কারণ মহব্বতের হস্তে যখন তিনি বন্দীভাবে ছিলেন, তখন মহব্বৎ সম্রাট্কে পদোচিত সম্মান যথেষ্টই দেখাইয়াছেন। সম্রাজ্ঞী যদি মহব্বৎকে মার্জ্জনা করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া কঠিন হয়; কারণ স্বামী-সান্নিধ্যলাভের আশায় সম্রাজ্ঞী মহ-ব্বতের নিকট স্বেচ্ছাবন্দিনী; মহব্বৎ সে ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া আয়ত্ত্বাধীন সম্রাটের দ্বারা নূরজাহানের বধদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করাইয়া নিতান্ত নীচজনোচিত কাপুরুষতার পরিচয়ই দিয়াছিলেন। এমন প্রাণবধকামী মর্ম্মান্তিক শত্রুকে যদি কেহ ক্ষমা করিতে না পারে, তবে তাহাকে দোষ দিতে হয় দাও, কিন্তু উহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

পথমধ্যে একদিন হঠাৎ মহব্বৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎকালে কেহ জানিতে পারে নাই; পরে প্রকাশ পাইল যে, তিনি শাহজাদা শাজাহানের বিদ্রোহী সেনাদলভুক্ত হইবার মানসে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিয়া-ছিলেন এবং শাহজাদার আশ্রয়ে থাকিয়া ভবিষ্যতে ভারত-সিংহাসন লইয়া যে উপপ্লব উপস্থিত হয়, তিনি সেই বীভৎস ব্যাপারে বিপুল আয়োজনে যোগদান করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোগশয্যায় জাহাঙ্গীর

আগ্রা দিল্লী প্রভৃতি স্থানের দুঃসহ গ্রীষ্মতাপ অসহ্য বোধ করিয়া জাহাঙ্গীর শাহ অনেক সময় কাশ্মীরে বাস করিতেন; এবারও তিনি গ্রীষ্ম কাটাইবার জন্য সেই স্থানেই গমন করিয়াছিলেন। অব্যবহিত পূর্ব্বে মহব্বতের হস্তে যে লাঞ্ছনা তিনি পাইয়াছিলেন এবং পথশ্রম, অস্বাধীন অবস্থার মানসিক পীড়া প্রভৃতি নানা-বিধ কারণ একত্র হইয়া বাদশাহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; এবং এই পীড়াই তাঁহার সম্ভবতঃ শেষ পীড়া, এ রোগশয্যা হইতে হয়ত তাঁহাকে আর উঠিতে হইবে না, এই ভাবিয়া সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে রাজধানীতে আনিবার জন্য ব্যস্ত হন।

রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত এই যাত্রা শোভা-যাত্রা নহে; ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া কি দুঃসহ দুঃখের বিপুল বেদনায় তাঁহার অন্তরাত্মা বাণবিদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় বারবার হৃদয়তলে অবলুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহা নূরজাহানের অন্তর্যামীই জানিতে পারিয়াছিলেন।

কৈশোরে যে প্রভাতসূর্য্যের নবোদিত রশ্মিসম্পাতে মেহেরের হৃৎপদ্ম উল্লসিত হইয়াছিল, যৌবনে যাঁহার

দীপ্ত আভার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া যোড়করে স্নেহ-জবার অর্ঘ্য উদ্দেশে প্রতিদিন তিনি প্রদান করিয়াছেন, অপরাহ্নের শান্ত শান্তিপর্ব্বে যাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে মণ্ডিত হইয়া তিনি জগদালোকরূপিণী হইয়া দীপ্তি পাইয়াছেন, আজ সেই নয়নানন্দ জীবনবন্ধু প্রাণাধিক প্রিয় সম্রাট্‌সূর্য্যকে অস্তশিখরীর পরপারে গমনোন্মুখ দেখিয়া মেহেরের মন কেমন ব্যাকুল হইতেছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

দিল্লীশ্বরের হকিম বৈদ্যের অভাব নাই, ঔষধপত্রেরও অসদ্ভাব ছিল না, শুশ্রূষা যথাসম্ভব হইয়াই থাকিবে। কিন্তু দিন দিন জাহাঙ্গীরের শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে হইল, দিল্লীশ্বর এবার অন্ধকার-পথের অনির্দ্দেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যদি বাহু বাড়াইয়া প্রাণাধিককে ধরিয়া রাখিতে পারিত, তবে আজ মেহেরের অন্তর লক্ষ বাহু বিস্তার করিয়া পরলোক-প্রয়াণ-উদ্যত প্রিয়তমের সর্ব্বাঙ্গ প্রাণপণ ব্যাকুলতায় জড়াইয়া ধরিত। কিন্তু হায়, প্রেম যে বড় দুর্ব্বল! জন্মমুহূর্ত্তে সে অন্তরে দুঃসহ বহ্নি এবং নয়নে অশ্রুনীর লইয়া উপস্থিত হয়; এবং পরমায়ুর অবশিষ্ট কয়টি দিন অশ্রুজলের প্লাবনের মধ্যে কেমন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে তাহার দিন কাটে, তাহা যাহার কাটে, বুঝি সেও ভাল করিয়া বলিতে পারে না।

মেহেরের স্নেহকাতর কিশোর হৃদয় তাহার আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় পায় নাই। বসন্তের মাধবীলতা যখন নন্দনের হরিচন্দনাশ্রয় খুঁজিয়া হৃদয়ের সদ্যসমুদ্গত নব নব স্নেহাঙ্কুরগুলি পরমাগ্রহে বাড়াইয়া দিতেছিল, নির্দ্দয় নিয়তি তখন তাহাকে কোন্ দূরতর স্থানে শাখোট়কের অপ্রার্থিত শাখায় জড়াইয়া দিল; মাধবীলতিকার অন্তর্গূঢ় পর্য্যাপ্ত মঞ্জরী-সম্ভার পুষ্পে পরিণত হইতে আর অবসর পাইল না। যে আশা আজ মিটিল না, কোন কালেই তাহা সার্থক হইবে না; যাহাকে আজ পাই নাই, সে চিরদিন সমান ভাবেই অপ্রাপ্য রহিয়া যাইবে,—হৃদয় এ কথা স্বীকার করিতে চাহে না। করিলে যে বিশ্বের আলোটুকু বন্ধ হইয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া, আনন্দটুকু নিঃশেষে লোপ পাইয়া, বিধাতার সৃষ্টি উৎসন্নে যাইতে বসে! যে আশালতা আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে স্থান পায়, তাহা আমাদের অন্তরের অন্তঃপুর-নিবাসীর মতই অবিনাশী; আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে চিরন্তন স্থান দান করি এবং প্রতিদিন উদয়াস্তকাল ধরিয়া অশ্রুনিষেকে তাহাকে জীবিত এবং পল্লবিত করিয়া রাখি। নবীন প্রভাতের আলোক-সম্পাতে নব জাগরণের সঙ্গে কত প্রকারের নব নব আনন্দ-উৎসব বিশ্বের নব সঞ্জীবন সম্পাদন করে; আশা-বল্লরীর মূলে নয়নাসার সিঞ্চন করিয়া তাহাকে জীবিত রাখাই যাহার একমাত্র নিত্য-

কৃত্য, সে তাহার জরাজীর্ণ চতুর্দ্দিকের পারিপার্শ্বিক পরি-বেষ্টনের মধ্যে ঐ কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিয়া কোন মতে তাহার জীর্ণ জীবন যাপন করে। মেহেরের কৈশোর ও যৌবন বুঝি বা সেই ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল। উদ্দাম যৌবনের বসন্ত-চঞ্চলতা যখন নাই, প্রৌঢ় যখন জীবন অধিকার করিয়াছে, নবীন আশার বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছ যখন তাহার বর্ণবৈচিত্র্যের ইন্দ্রজাল চক্ষের সম্মুখে ধরা একরূপ শেষ করিয়াছে, জীবনের মধ্যে নানা প্রকার দুঃখ দৈন্য পরিপাক করিয়া যখন জীবন পরিণত হয় হয় হইয়াছে, ত্যাগ আসিয়া যখন কাণে কাণে কথা বলা প্রায় আরম্ভ করিয়াছে, যখন অনায়ত্ত কল্পনালোকের কুহকিনী উন্মাদ আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপনার মধ্যে তাহাকে প্রায় সংযত করিয়া আনিয়াছে, সাশ্রুনেত্রে বারবার তাহার দিকে চাহিবার ইচ্ছা থাকিলেও আর সে দুঃখ বহন করিব না ভাবিয়াছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন দিল্লী-রাজপ্রাসাদের স্থবর্ণ সৌধমন্দির হইতে হৃদয়-দেবতার ব্যাকুল আহ্বান মেহেরের কাণে গেল। নন্দনন্দনের রাসরজনীর অনঙ্গবর্দ্ধন বংশী-নিনাদও বুঝি ব্রজগোপীর কাণে এমন মধুর বলিয়া বোধ হয় নাই।

এই চিরাকাঙ্ক্ষিত আহ্বানের আকর্ষণ মেহেরকে জীবন-অপরাহ্নেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রোজার

উপবাসের শেষ দিন মুসলমান সম্প্রদায়ের “ঈদ” পর্ব্ব; সেদিন সকলেরই উপবাস-ক্লেশের অন্ত হয়। সেই দিন মেহেরের চির-উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের চির “রোজা” চিরদিনের জন্য জাহাঙ্গীরের ইচ্ছায় অবসান হইল, সেই দিন মেহের জাহাঙ্গীরের বামপার্শ্বে তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত স্থানটি অধিকার করিতে অবসর পাইল। এ স্বামী তাহার কুশণ্ডিকার মন্ত্রপাঠের স্বামী নহে; এ স্বামী তাহার কোরাণের কল্‌মাপড়া ভাত-কবুলের স্বামী নহে; এ স্বামী তাহার পুল্‌পিটের সম্মুখীন হইয়া হাঁটু-গাড়া স্বামী নহে, এবং এ স্বামী তাহার রেজিষ্ট্রি আফিসে মোহরছেপ্ত দলিলের স্বামী নহে! এ স্বামী তাহার কৈশোর হৃৎপদ্মের তরুণ দিবাকর, যৌবন-কুমুদিনীর পূর্ণ শশধর, পরিশ্রান্ত মরুপান্থের পান্থপাদপ, দিগ্‌ভ্রান্ত নৌযাত্রীর ধ্রুব-নক্ষত্রের আশাজ্যোতিঃ; তাহার সমস্ত জন্মজন্মান্তরের, তাহার সমগ্র জীবন-মরণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; এ স্বামী তাঁহার বক্ষের মহার্ঘ মণি-হার, তাঁহার চক্ষের জ্যোতিঃ, নিঃশ্বাসের বায়ু, তাঁহার বসন্তের আনন্দ-চাঞ্চল্য, তাঁহার শরদাকাশের সান্ধ্যরক্ত-রাগ; এ স্বামী তাঁহার কি যে, তাহা যাহার এমন স্বামী হইয়াছে সেই বলিতে পারে। যাহার অনুধ্যানে বসিয়া সে তপোবন-লালিতা শকুন্তলার ন্যায় কর্ত্তব্যে ত্রুটি করে নাই এমন কথা বলিতে পারে না, যাহার বিহনে ব্যর্থ-

জীবন আর বহিতে পারি না বলিয়া নিশীথ-নয়নজলে উপাধান সিক্ত করিয়াছে, যাহার নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছেদে জীবনের প্রতিদিন শেষদিন হউক বলিয়া প্রাণপণে কামনা করিয়াছে, বুকের ধন সেই স্পর্শমাণিক, কাঙ্গালের সেই হারানিধি, যখন সমস্ত বিচ্ছেদ বিরহ বেদনা বিদূরিত করিয়া বুকের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল, মেহের তখন অন্তরের মধ্যে জীবনের কি গভীর পরিতৃপ্তি, কি অপ্রত্যাশিত সার্থকতা অনুভব করিয়াছিল, তাহা সেই জানিত ;—তার পরে বহুবর্ষ ধরিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে উৎসবে ব্যসনে কর্ম্মে নর্ম্মে যাহার সঙ্গে একপথে এক উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, যাহার জন্য অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও শত্রুপরিবেষ্টিত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুন্ঠিত হয় নাই, বিপুলকায়া বর্ষা-তরঙ্গিণীর মৃত্যু-তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেও তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করে নাই, সেই প্রাণাধিক প্রাণ, প্রিয়-সখা, জীবনবন্ধুকে চিরজীবনের জন্য হারাইতে বসিয়া সমাসন্ন বৈধব্যের দুঃসহ বেদনা তাহাকে কেমন করিয়া বিহ্বল করিয়াছিল, তাহা সেই মেহের ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারে না। উদয়াস্ত, পতন-অভ্যুত্থান, জন্ম-মৃত্যু জগতের চিরন্তন পদ্ধতি। এই জগচ্চক্র চিরভ্রাম্যমাণ। সুখ এবং শোক, আনন্দ ও নিরানন্দ, হর্ষের হাস্য ও বেদনার রোদন, সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে মানব-ভাগ্যে

উপস্থিত হয়। ইচ্ছা কর আর নাই কর, দুঃখ আসিয়া অনাহূত অতিথির মত তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেই, তোমার জীবনসার নিঃশেষে শোষণ করিয়া নিরাশার গুরুভার বিন্ধ্যগিরি তোমার বক্ষের উপর চাপাইয়া তোমাকে নিষ্পেষিত করিবার যথাবিধি ব্যবস্থায় তাহার কোন ত্রুটিই হইবে না।

প্রথম জীবনে বিপুল বেদনা পাইয়াও দেহমনের শক্তির একান্ত অভাব হয় না; দিগন্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটার ন্যায় সংসার নানাবর্ণের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া আমাদের তরুণ নয়নমন অপহরণের চেষ্টা করে; দুঃখদলিত হৃদয়-মালতীর নবোদ্গত অঙ্কুরগুলি নানাদিক হইতে আবার আশ্রয় খুঁজিয়া মরে। কিন্তু পরিণত বয়সে, জীবন-সায়াহ্নে, যে স্নেহবেষ্টনের মধ্যে বিঘ্নবিহীন শেষ-শয়ন বিছাইয়াছি, অকস্মাৎ একদিন প্রলয়-ঝটিকা ও বিদ্যুৎ-বহ্নির প্রচণ্ড প্রভাবে যদি সেই নিরাপদ নীড়টি ভূমিশায়ী হইয়া এক নিমেষে বিশাল বিশ্বে নিরাশ্রয় হইতে হয়, তবে সেই নিরালম্ব দুর্ব্বহ জীবন শেষ হইলে যে কি নিষ্কৃতি, তাহা যাহার প্রার্থনা করিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে, সেই জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বল্লভবিয়োগে

মেহের আজ তাহার ত্রিভুবনের একমাত্র আশ্রয়ের নির্ভরতা হইতে স্খলিত হইতেছে; যাঁহাকে বুকের কাছে পাইয়া জীবনভরা অশ্রুজলের নিবৃত্তি হইয়াছিল, যাঁহার প্রেমবেষ্টনের মধ্যে ইহলোকের সব সাধ মিটিয়াছে, যাঁহার নয়নের আলো বলিয়া মেহের "নূরজাহাঁ" (দুনিয়ার আলো) আখ্যা লাভ করিয়াছে, দুঃসহ দৈন্য ও দুঃখের মধ্যে পথপার্শ্বপ্রসূতা দরিদ্রের কন্যা যাঁহার প্রসাদে দুনিয়ার বাদশাহের প্রিয়তমা মহিষী, সেই প্রাণাধিক প্রিয়, মেহেরের নয়নমণি, জীবিতাবলম্বন, জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের জীবলীলার আজ অবসান হইতে বসিয়াছে; মেহেরের বেদনা কি বলিয়া শেষ করা যায়?

মলয়মারুতের দক্ষিণস্পর্শে মালঞ্চের পুষ্পমঞ্চে মাধবী-মঞ্জরীর যখন মহামহোৎসবের সূচনা হইতেছে, তখন যদি ঈশানের বিষাণ-রবে প্রলয়-ঝঞ্ঝার অকস্মাৎ আগমন পুষ্পবিতানটিকে ভূমিশায়ী করে—তখন অসহায় মাধবী-মুকুলকে ধূলিতলেই তাহার অন্তিমশয়ন বিছাইতে হয়—মেহেরের আজ সেই দশা! অবশ্যসম্ভাব্য যদি

ঘটিবেই, তবে রাজধানী পঁহুছিয়া পাত্রমিত্র সভাসদ মন্ত্রী সামন্ত রাজগণ সকলের সম্মুখেই ভারতপতির অন্তিম নিমেষপাত হইয়া যায়, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছাগুলি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া জাঁহাপনার দেহাত্যয় ঘটে, ইহাই মেহেরের বড় ইচ্ছা ছিল; এবং সেই জন্য প্রাণপাত যত্ন ও শুশ্রূষায় বাদশাহকে যথাসম্ভব সবল রাখিয়া দিবানিশি পথ চলিয়া লাহোরের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। যাঁহার ইচ্ছায় পরমাণু হইতে ধরাধর পর্য্যন্ত ত্রিলোকের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় ঘটিতেছে, তাঁহার ও মেহেরের ইচ্ছা এ ক্ষেত্রে এক হইতে পারে নাই।

বাদশাহের রোগক্লিষ্ট ভঙ্গুর দেহ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। রাজধানী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুনিয়ার মালিক জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীর শাহ দিল্লীসিংহাসন শূন্য করিয়া, আশ্রিত অনুগত গুণানুরক্তদিগকে চিরদিনের জন্য শোকাশ্রুনীরে ভাসাইয়া, প্রাণপুত্তলী মেহেরের হৃদয়পঞ্জর বজ্রবেদনায় বিদীর্ণ করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যে নয়ন ক্রোধবশতঃ রক্তরাগ-রঞ্জিত হইলে, সমগ্র ভারত প্রাণভয়ে কম্পিত হইত, যে অপাঙ্গের বিলোল ভঙ্গী যুবতী-হৃদয়ে আপুঙ্খ-নিমজ্জিত পুষ্পবিশিখের ব্যাকুল বেদনা জাগাইয়া তুলিত, যে নয়নের স্নেহকাতর প্রেমাশ্রুপ্লুত

পবিত্র দৃষ্টি মেহেরকে চিরজীবনের জন্য পাগল করিয়া রাখিয়াছিল, অফুরন্ত পথের যাত্রী জাহাঙ্গীরের পথের ধূলিতলেই সেই নয়নের শেষ নিমেষপাত হইয়া গেল।

শোনা যায় "পতিতঃ পর্ব্বতো লঘুঃ"। কথাটা কি সত্য? সহ্যসীমার অতিরিক্ত গুরুভার দুঃখ কি আমাদের জীবনসার নিঃশেষে নিষ্পেষিত করিয়া লইয়া আমাদিগকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিয়া যায় না? পতিত পর্ব্বতকে কি সব সময় আমরা লঘুভাবেই গ্রহণ করিতে পারি? আজ যে অসীম দুঃখ, বৈধব্যের বিপুল বেদনা, প্রিয়বিরহের অনন্ত যন্ত্রণা মেহেরকে এক নিমেষে পাষাণপ্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল, তাহাকে লঘু বলিয়া উপেক্ষা যে করিতে পারে করুক, মেহেরের মত পরম স্নেহের অমূল্য মাণিক হারাইয়া যাহাকে আবার জীবন বহন করিতে হইয়াছে, সেই জানে সব সময়ে সকল দুঃখকে লঘু বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

সংসারত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসী শেখ সেলিম চিস্তির শুভাশীর্ব্বাদের ফলে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। আকবর শাহের পরিত্যক্ত বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসিয়াও তাঁহার সমগ্র জীবন সুখে যায় নাই, জীবনাপরাহ্ণে চিরজীবনের কামনার ধন মেহেরের স্নেহবক্ষের অঞ্চলতলে, নিরাপদ স্নেহনীড়ের মধ্যে, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দিন যখন সমা-

গত, মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য কোন্ দূরান্তরের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ তাঁহার আহ্বান আসিল—উদাসীনের আশী-র্ব্বাদবলে জাত রাজনন্দনের উদাসীনের ন্যায় পথপ্রান্তেই পার্থিবনয়ন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল।

যে গেল সে ত বাঁচিয়াই গেল, অন্ততঃ পক্ষে আমরা ভাবি যে সে বাঁচিয়া গেল। যে জন্মান্তর মানে না তাহার নিকট এই রঙ্গমঞ্চই শেষ অভিনয়ের স্থান, এ সংসারের সুখদুঃখের অভিনয় শেষ হইয়া গেলেই তাহার কাছে চিরনিবৃত্তি; আর জন্ম নাই, সুতরাং রোগ নাই জরা নাই মৃত্যু নাই—এইবার যে নিমেষ-পাত হইয়া গেল, আর চক্ষু মেলিতে হইবে না, আর পিতা-পুত্র, শ্বশুর-জামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী সাজিয়া রঙ্গ-মঞ্চে চড়িয়া দশের তৃপ্তি অতৃপ্তির অপেক্ষায় প্রাণপণে অভিনয়ের উদ্যম করিতে হইবে না। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ যে দিন ভস্মীভূত কিংবা প্রোথিত করা হইল বা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, সেই হইতে চিরকালের জন্য চিরনিবৃত্তির মহামৌনতার মধ্যে চিরনির্ব্বাণ পাইলাম —দেহাতিরিক্ত দেহী নাই, সুতরাং দেহান্তর প্রাপ্তিজন্য পুনরায় জন্ম যৌবন জরার যাতনা আর পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। যাঁহারা বিমল বিপুল বুদ্ধিবলে দেহাতি-রিক্ত দেহীর সত্ত্বা স্বীকার করিয়া লোক-লোকান্তরের কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই পার্থিব-দেহের নাশের

সঙ্গে দেহীর নাশ স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে ইহজন্মের লীলা খেলার শেষ হইলেই সব শেষ হইল না, ইহার পরেও জন্ম হইবে, মৃত্যু হইবে,—কতবার হইবে, কত সুখ কত দুঃখ আবার ভোগ করিতে হইবে; এইরূপ লোক-লোকান্তরে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে একদিন এক শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি, সুখশোক সকলের হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া জীবের এক আনন্দময় সত্ত্বা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না এবং সেই আনন্দলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ।

জানি না ইহা সত্য কি না, জানিবার কোন উপায়ও নাই—হয়ত সত্য, হয়ত বা সত্য নহে; কেবল চিরন্তন দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর অক্ষম উপায়হীন নরনারীর শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য দয়াপরবশ বুদ্ধিমানের উদ্ভাবনী কল্পনার আশাসৃষ্টি—যে আশাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এ ধরার দুঃখময় দিনগুলিকে বুক দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে চাই,—দুঃখের পরে সুখ আছে এই ভাবিয়া বর্ত্তমানকে বহনীয় ও সহনীয় করিবার উদ্যমের মধ্যে কোনমতে বাঁচিয়া থাকি।

কিন্তু হায়, প্রিয়জনের সদ্যশোক কোন সান্ত্বনা কি মানে? লোকান্তরে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সুখে আছে, এই আশ্বাস নববৈধব্যের অসহ্য

যন্ত্রণার কোন উপশম কি করিতে পারে? যার দেহের সেবা আমার দিনের কাজ, যার মনের আনন্দ-বিধান আমার দৈনিক জীবনের তপশ্চরণ, আমার ত্রিলোক যে একটিমাত্র লোকের মধ্যে সংহত হইয়া আসিয়াছে, সেই আমার-একমাত্রের অভাবে যে সর্ব্ব-অভাব সমুপস্থিত হয়, জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, কোন আশা, কোন আশ্বাস, কোন সান্ত্বনাই যে বিয়োগ-বিধুরার আকুল অশ্রুস্রোতে বালির বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারে না!

জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের জীবলীলার অবসান হইয়াছে। রাজ্যের দীনতম জনের দিনও যেমন চলিতে-ছিল সেইরূপই চলিতেছে। শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই। এক দিকে দক্ষ রাজকুমার শাজাহান, মন্ত্রী আসফ খাঁ ও সুদক্ষ সেনাপতি মহব্বতের সহায়তায় রাজদণ্ডের দিকে দক্ষিণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে সসৈন্যে অভিযান-উদ্যত; প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যে রাজ্যের কোন কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি খস্রুনন্দন বুলাকীর পক্ষপাতী; সুতরাং পরলোকগত রাজাধিরাজের মৃত্যু-শোকাভিভূতের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করিতে পারা যায়। শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হইবে এবং হইয়াওছিল, রাজ্যের ছোট বড় সকলেই পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ

করিয়া ক্ষমতাপন্নের শরণাপন্ন হইয়াছিল, অশান্তি অরাজকতা দ্বিধাদ্বন্দ্ব যুদ্ধবিগ্রহ সব ঘুচিয়া গিয়া অচিরকাল মধ্যে রাজনৈতিক আকাশে নিরাময় শান্তির নির্ম্মল নীলিমা বিরাজিত হইয়াছিল। এক অধীশ্বরের পরিবর্ত্তে আর একজন আসিয়া শাসনদণ্ড ধরিলেন, রাজ্য যেমন চলিতেছিল তেমনই আবার চলিতে লাগিল, কোথাও কোন শূন্য যে ঘটিয়াছিল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। কেবল এই বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের যিনি একাধীশ্বরী ছিলেন, যাঁহার কৃপা-অকৃপার উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের জীবন-মরণ নির্ভর করিত, কেবল তিনিই আজ জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার হৃদিনন্দনের আনন্দ-পারিজাত আজ চিরদিনের জন্য শুকাইয়া গিয়াছে, নয়নের অমৃতবর্ত্তি আজ হারাইয়া গিয়াছে; দেহমনের অবলম্বন হারাইয়া রাজরাজেশ্বরী আজ ধরণীর ধুলিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন! পথপার্শ্বপ্রসূতা সদ্যোজাতা কন্যকার শিরোপরি নাগরাজ অনন্তফণা বিস্তার করিয়া আতপতাপ নিবারণ করিয়াছিল; তারপর যেদিন জীবনাপরাহ্ণে অন্তরের নিগূঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বসিবার আয়োজন হইবে, সেই দিন মেহেরের জীবন-দেবতার প্রেমের আহ্বান তাঁহাকে মোগল রাজশালার মণিময় রাজছত্রতলে ডাকিয়া আনিল। আজ আবার

ছত্র দণ্ড সিংহাসন ও হৃদি-সিংহাসনের একাধীশ্বর বল্লভতম প্রিয় দয়িতকে হারাইয়া রাজরাণী এক নিমেষে কেমন করিয়া কাঙালিনী হইয়াছেন, এবং সেই কাঙাল হৃদয়ের আর্ত্তি তাঁহাকে কেমন করিয়া মরণযাচ্ঞা করাইতেছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেলিম-মেহেরের প্রণয়, কিশোরকিশোরী বা যুবকযুবতীর এক নিমেষের চক্ষের দেখার প্রণয় নহে; প্রথম দর্শনে উভয়ে উভয়কে ভাল-বাসিয়াছিল বটে, কিন্তু জীবন-প্রভাতের সেই প্রথম দর্শনের পরই তাহাদের মিলন সঙ্ঘটন হয় নাই; বরং নানা বিচিত্র ঘটনায় দুইজন জীবনের বিভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছিল; ইহলোকে তাহাদের হৃদয়ের আশা যে কোন দিন পূর্ণ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা কাহারই মনে উদয় হয় নাই। বিভিন্ন প্রকারের অবস্থার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছিল। যখন জীবনাপরাহ্ণে সমগ্র জীবনের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সংহরণ করিয়া শেষদিনের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আসিয়াছে, যাহা ইহজীবনে পাওয়া যায় নাই, জন্মান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য তপশ্চরণের যখন সময় আসিয়াছে, জীবনের সেই শান্তসন্ধ্যায় জীবনাধিকের অপ্রত্যাশিত মিলনলাভ করিয়া কি অপরিমেয় আনন্দের মধ্যে মেহের তাহার নবজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সেই জানিত। আবার নির্দ্দয়

মৃত্যু যখন সেই প্রাণতুল্য প্রিয় দয়িতের জীবন অপহরণ করতঃ মেহেরের ইহলোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়া ধূলিতলে তাহার শয়ন বিছাইয়া দিল, মেহেরের সেদিনের অপরিসীম যন্ত্রণা বাক্যমনের অতীত !

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামি-নিদেশ

দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তের অন্তিম-ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তিটুকুও মেহেরের ছিল না। অথচ প্রাণাধিক প্রিয়পতির শেষ-নিদেশ পালনার্থ যত্নচেষ্টা না করিয়া মেহেরের ন্যায় প্রণয়শালিনী পত্নীর উদাসীন থাকাও অসম্ভব। যাঁহার স্নেহের বলে ভারত সাম্রাজ্য মেহেরের পদতলে লুণ্ঠিত হইত, যাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রশ্রয় পাইয়া মেহেরই হিন্দুস্থানের প্রকৃত বাদশাহ হইয়াছিল, সে জাহাঙ্গীর আজ নাই, একমাত্র তাঁহার অভাবে আজ তাঁহার প্রেমাশ্রিতা প্রিয়তমার কি দুর্দ্দশা সমুপস্থিত! যে মেহেরের হৃদ্গত ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইত, আজ তাঁহার রাজরাজেশ্বর স্বামি-দেবতার মৃত্যু-মুহূর্ত্তের একান্ত ইচ্ছাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে সহায় খুঁজিতে হইতেছে—সে সহায়ও মিলিতেছে না।

ধরণীর অসহায় জীব, অন্তরের মধ্যে অপরিমেয় স্নেহ ও অপরিসীম ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি সঞ্চিত করিয়া একজনের পাদপদ্মে এমনি করিয়া নিঃশেষে ঢালিয়া

দিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহারই জীবনে জীবন, অদৃষ্টে অদৃষ্ট এমনি অচ্ছেহ্য বন্ধনে কেন যে বাঁধিয়া দেয়, এবং নিমেষে টুটিয়া গেলে কেন যে এমন নিঃসহায় হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়, কে বলিয়া দিবে? কোন্ ঐন্দ্রজালিক অন্তঃপটে বসিয়া অদৃশ্যে এই রহস্য সৃজন করিতেছেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবের এই পতন-অভ্যুত্থান ঘটাইয়া বিশ্বসৃষ্টির কি সৌকর্য্য বিধান হইতেছে, অসহায় মানব মানবীর দুঃসহ হৃদয়-বেদনার উপর কোন্ দেবতার এ নির্ম্মম অট্টহাস্য, তাহা জানি না। জানি কেবল দুঃখ, জানি কেবল একজনের অভাব হইলে, একজনকে না পাইলে, একজনকে পাইয়া হারাইলে, অপরের নিদারুণ যন্ত্রণা, এবং প্রাণত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিল তিল করিয়া তুষানল।

মেহেরের সেই তুষানল আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমুহূর্ত্তে যখন মৃত্যুযাচ্ঞা করিবার দিন আসিয়াছে, প্রিয়তমের একান্ত বিরহে যখন দেহ বহন করিয়া এ পৃথিবীতে থাকা দুঃসাধ্য মনে হইতেছে, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যখন মনে হইতেছে এ "অজপার" কবে শেষ হইবে, সেই সময় স্বামি-নিদেশ মাথায় লইয়া জাহাঙ্গীরের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান শহরিয়ারকে সাম্রাজ্য দিবার প্রাণপণ চেষ্টা বিধবাকেই করিতে হইতেছে; এ যে কি দুর্ভোগ, তাহা যাহার ভুগিতে হইয়াছে সেই

জানে, অপরের অনুভূতি সে অসহ্য বেদনার যথাযথ পরিমাপ করিতে পারে না।

শহরিয়ার কর্ম্মপটু নহে, সক্ষম বীরপুরুষ বলিয়া কোন দিনই তার খ্যাতি ছিল না, পিতা জাহাঙ্গীরের বাধ্যানুগত হইয়া চিরজীবন যাপন করিয়াছে, সেই জন্য—এবং কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া—পিতার স্নেহ তার প্রতি সমধিক ছিল। শাজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিল, এই সব কারণে জাহাঙ্গীর মৃত্যুকালে শহরিয়ারকে সিংহাসন দিবার কল্পনা করেন। জীবনে কুলায় নাই, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে নূরজাহান স্বামীর নিদেশ পালনে যত্নবতী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শহরিয়ার নূরজাহানের জামাতা, তিনি রাজ্য পাইলে নূরজাহানের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে নূরজাহান শহরিয়ারের সিংহাসনপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। একথার স্বপক্ষে বিপক্ষে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, তবে শহরিয়ারকে সিংহাসন দিবার ইচ্ছা যে জাহাঙ্গীরের ছিল, এবং মৃত্যুকালে সে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং নূরজাহানের পক্ষে শহরিয়ারকে সাহায্য করিবার অন্য যে কোন কারণই থাকুক না, পতিনিদেশ যে তাহার একতম কারণ, ইহা ইতিহাসবিৎ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

নূরজাহান জানিতেন শাজাহান বীরপুরুষ, বহুযুদ্ধে স্বয়ং লিপ্ত থাকিয়া, বাদশাহী সৈন্য চালনা করিয়া, রণপাণ্ডিত্য তাঁহার জন্মিয়াছিল; বহুপ্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে সুবাদারের কার্য্য করিয়া রাজকার্য্যে তিনি সুনিপুণ হইয়াছিলেন; উদয়পুর প্রভৃতি হিন্দু রাজপুত রাজগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব-স্থাপন হইয়াছিল; মন্ত্রী আসফ খাঁ তাঁহার শ্বশুর, সুতরাং তাঁহার সহায়তা শাজাহান লাভ করিবেন; সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ মহাবীর, সেই পলাতক মহব্বৎকে আশ্রয় দিয়া শাজাহান তাঁহার সহিত আনুগত্য-স্থাপন করিয়াছেন—এই সমস্ত কারণে কেবল তাঁহারই সহায়তায় শহরিয়ার শাজাহানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া সিংহাসন লাভে সক্ষম হইবে না—একথা এতদিন রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার পর বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জানিতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। শাজাহানের সহিত শহরিয়ারের সংঘর্ষে পরাজয় সুনিশ্চিত, ব্যর্থমনোরথ হইতেই হইবে, শাজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে—ইহা জানিয়াও দুর্ব্বলের পক্ষই যে নূরজাহান অবলম্বন করিয়াছিলেন, স্বামি-নিদেশে কর্ত্তব্যের প্রেরণাই তাহার কারণ; এবং নূরজাহানের পূর্ব্বাপর জীবনেতিহাস ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে এই মীমাংসাতেই সকলকে আসিতে হয়।

সিংহাসনের জন্য দুই ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দ্বন্দ্বে পরাজিত শহরিয়ারের জীবলীলার শেষ হওয়ায় ভ্রাতৃবিরোধভীতি আর শাজাহানকে উৎকন্ঠিত করিতে পারে নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে সসৈন্যে রাজধানী পঁহুছিতে জামাতা শাজাহানের বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা; এবং ততদিন সিংহাসন শূন্য থাকিলে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বুদ্ধিবলে শহরিয়ার তাহা অধিকার করিয়া বসিলে তাহার ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে, এবং সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্‌কে ত্যাগ করিয়া রাজ্যের অনেক পদস্থ আমীর ওমরাহ শাজাহানের পক্ষ অবলম্বন না করিতেও পারে —এই সকল বিবেচনা করিয়া শহরিয়ারের পথরোধ ও ভগিনী নূরজাহানের সঙ্কল্প বিফল করিবার জন্য মন্ত্রী আসফ খাঁ, খশ্রুনন্দন বুলাকীকে শাজাহানের সসৈন্যে আগমন কাল পর্য্যন্ত সিংহাসনে বসাইয়া দেন। আসফ জানিতেন, শাজাহানের বীর্য্যের নিকট বালক বুলাকী অচিরাৎ পরাস্ত হইবে, অধিকতর ক্ষমতাশীল শাজাহানের পদতলে সাম্রাজ্যের অবনত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। শাজাহান সসৈন্যে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়ামাত্র বালক বুলাকী ভীত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করতঃ পলায়ন করে; এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন সিংহাসন

শাজাহান নিষ্কণ্টকে অধিকার করিয়া বসিলেন; সাময়িক উপপ্লব যাহা রাজ্যে ঘটিয়াছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া গেল, ভারত সাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল; একমাত্র নূরজাহানকে সমস্ত দুঃখের ভার মাথায় লইয়া অসৌভাগ্যের শান্তিহীন সান্ত্বনাবিহীন দীর্ঘ দিনগুলি বহুদিন ধরিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পাষাণ-প্রতিমা

প্রিয়সম্মিলন যখন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল, তখন আত্মীয় স্বজন যাহার হাতে মেহেরকে তুলিয়া দিয়াছিল, মেহের তাহারই সঙ্গে রাজধানী ত্যাগ করিয়া সুদূর বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম বর্দ্ধমানে আসিয়া দিনযাপনের জন্য সংসার পাতিয়া বসিল। সে সব দিন সুখে কি দুঃখে গিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। অন্তরের একান্ত কামনার চিরবাঞ্ছিত জনকে এ জন্মে আর পাইবই না, মনের এই অবস্থা লইয়া দিনাতিপাতের যে আয়োজন, সে আয়োজন কি সুখের হইতে পারে? শরীর থাকিলে আহারনিদ্রা করিতে হয়, মেহেরও করিত। একজনের গৃহিণী হইলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কাজের ভার স্কন্ধে আসিয়া চাপে, সেগুলি না করিলে সংসার চলে না; সুতরাং মেহের আলীকুলীর গৃহিণী হইয়া তাহার সংসারও চালাইত, কিন্তু প্রণয়িণী গৃহিণী হইলে সংসারের দিনগুলি যেমন নৃত্যের লাস্যলীলায় চতুর্দ্দিকে আনন্দতরঙ্গ তুলিয়া লঘুপদে দ্রুত চলিয়া যায়, আলী-মেহেরের সাংসারিক দিন হয়ত তেমন করিয়া অতিবাহিত হয় নাই। সুখ-

দুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের সে অধ্যায় শেষ হইল ; হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া যখন একান্তে বসিবার সময়, তখন জীবনাধিকের স্নেহ-আহ্বান মেহের উপেক্ষা করিতে পারে নাই ; এক সময়ে পায় নাই বলিয়া সময়ান্তরে যে আনন্দ আপনি আসিয়া মেহেরের করতলগত হইয়াছিল, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা মেহেরের হয় নাই ; আজীবনসঞ্চিত অন্তরের স্নেহরস যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া মেহেরের মনে বিপুল বেদনার সঞ্চার করিতেছিল, স্নেহকাঙাল রাজভিখারীর রিক্ত দুই হস্ত সেই স্নেহে ভরিয়া দিয়া মেহেরের নারীজীবন সে সফল করিয়াছিল এবং রাজাধিরাজও হিন্দুস্থানের সম্পদরাশির উপর বসিয়া যে ব্যর্থতার বেদনায় চিরকাতর ছিলেন, তাঁহার সে ব্যর্থ জীবন ও জন্ম ধন্য হইয়াছিল। রাজকান্তের স্নেহহীন অন্ধকার জীবন মেহেরের সেবা-সোহাগের মণিদীপ-জ্যোতি পাইয়া ছায়াচ্ছন্ন আয়ু-অপরাহ্নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই স্নেহবর্ত্তিকার স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে যখন তাঁহার নয়ন চিরমুদ্রিত হইয়া গেল, তখন জীবনের ব্যর্থতার জন্য শোকসন্নত হৃদয় লইয়া তাঁহাকে বিদায় হইতে হয় নাই ; কিন্তু যাঁর বুকভরা স্নেহের দান হাত ভরিয়া নিয়া রাজনন্দন ধন্য হইয়াছেন, সেই জাহাঙ্গীরের দেহান্তরের পর তাঁহার হৃদয়নিধি,

চিরকামনার স্পর্শমণি, জন্মজন্মান্তরের আশা ও বাসনার আকাঙ্ক্ষিত ধন মেহেরের দুঃখের দিন বিন্ধ্যাচলের মত অচল হইয়া কেমন করিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা দেখিবার তখন তো আর কেহই ছিল না! দিনারম্ভ হইতে দিনান্ত এবং দিন-শেষ হইতে অরুণোদয় পর্য্যন্ত আশাহীন উদ্যমহীন প্রয়োজনবিহীন দেহ ও প্রাণ বহন করিয়া স্নেহ-লেশশূন্য ধরণীর নীরস ধূলিতলে আয়ুযাপন কি দুঃসহ দুঃখের ভোগ তাহা প্রিয়-বিরহ-কাতর জনেই জানে। দিনযামিনীর অবিচ্ছেদ সাহচর্য্যে প্রিয়তমকে পাইয়া, কৈশোরের মনচোরকে প্রৌঢ়ের পরিণত প্রণয়ের প্রগাঢ় পরিরম্ভের মধ্যে ধরিয়া যাহার আনন্দ-মহোৎসবে দিন কাটিয়া গিয়াছে, নিরালম্ব নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় বৈধব্যের দিন তাহার কি কাটে? দুঃখদীর্ণ জীবন যে দীর্ঘ হইয়াই চলে! প্রাণপণে শেষের দিনকে ডাকিলেই যদি আসিত, তবে একা মেহের কেন, পৃথিবীর আদি-সৃষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কোটি কোটি নরনারী গলবস্ত্র হইয়া সূর্য্যসূতের শরণ যাচিয়া ব্যগ্র প্রতীক্ষায় কাল কাটাইত। সুখের গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই রবিনন্দনের অনুচরের আবির্ভাব হয়, দুঃখের দিনে তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠে। সেলিম মেহেরের কেবল মন্ত্রপূত স্বামী ছিল না, সে যে

তাঁহার হৃদয়পুষ্পের আসবলোলুপ প্রিয়মধুকর ; হোম-ধূমের অশ্রু-আরম্ভের মধ্যে তাহাদের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়া, বৈধব্যের দিনে উভয়তঃ সে অশ্রুর শেষ হইয়াছিল এমন নহে ; উভয়ে উভয়ের যে পরম যত্নে আহরিত অমূল্য নিধি, তাই এ বিয়োগ যে বিধবার প্রাণবিয়োগের সমতুল। যে জীবনাধিক প্রিয়ধন, যাহার চরণতলে দেহমন সমর্পণ করিয়া জীবন ও জন্ম সফল করিয়াছি, যাহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া অখণ্ড আনন্দের মধ্যে জীবনের সব সার্থকতা লাভ করিয়াছি, অনন্যমনে বহুবর্ষ অনুধ্যান-জনিত পুণ্যবলে যে একান্ত প্রিয়লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার ক্ষণিক বিরহই যমযাতনা দেয়—এ জন্মের মত তাহার সহিত চিরবিরহ যে কি দুঃসহ বেদনা তাহা ভুক্তভোগীই অন্তরে অন্তরে অনুভব করে।

আজ মেহেরের সেই চিরবিরহের দিন সমুপস্থিত। এ বিরহ ক্ষণিকের নয়,—যতদিন দেহ থাকিবে, অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রতি মুহূর্ত্ত প্রিয়তমের বিরহ-বেদনার ব্যাকুল অশ্রু তাহার দুই নয়ন অন্ধ করিয়াই রাখিবে। এ জীবনে প্রাণাধিক প্রিয়কে চির-সান্নিধ্যের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না ; তাহাকে দিনান্তদর্শনের সৌভাগ্যটুকু যদি থাকে, তাহার প্রিয় মুখখানি দেখিয়া, 'প্রাণপ্রিয় ধন আমার সুস্থ আছে, সুখে আছে' জানিয়াও আমার বুভুক্ষিত প্রেমের

মর্ম্মঘাতী বেদনার কথঞ্চিৎ উপশম হয়; কিন্তু এ জীবনের লীলা শেষ করিয়া, প্রেমাশ্রিত জনকে চিরবিরহের দুঃসহ দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, প্রিয়-দয়িত যখন লোকান্তর যাত্রা করে, বিধবার সে দিনের বক্ষ-বেদনা কেবল দুঃসহ বলিলে যে তাহার যথাযথ বর্ণনা হয় না! নিঃশ্বাস চলে বটে, কিন্তু তাহাকে প্রাণধারণ বলা যায় না। শ্রবণ, নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাদের কার্য্য হয়ত বা করিয়া যায়, কিন্তু সে কার্য্যের ফলভোগী মন কি তাহার সংবাদ সব সময়ে লইবার মত অবস্থায় থাকে?

একজনের জীবিতকালে তাহার স্নেহ-ব্যাকুল বাহুর বেষ্টনের মধ্যে, ফাল্গুনপূর্ণিমার রজত-কিরণধারায় স্নান-স্নিগ্ধা মেদিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য, মালঞ্চবিতানোত্থিত মল্লিমালতীর মনোমদ গন্ধ, আম্রমঞ্জরীর সুধারসতৃপ্ত বসন্তবৈতালিকের মনোমোহন কণ্ঠ যেমন করিয়া দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করে, সেই স্নেহ বাহুদু'টি যখন কালের অকরুণ হস্ত আসিয়া আমার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া দেয়, তখনও চিরদিনের এই বসন্তবর্ষাশরদ-শ্লিষ্ঠিতা প্রবীণা ধরণী বর্ষে বর্ষে তেমনি করিয়াই নবীনা হইয়া ওঠে; মলয়াচলসম্পৃক্ত মন্দানিল বর্ষে বর্ষে বসন্তের পুষ্পবাটিকায় তেমনি করিয়াই অতিথির বেশে উপস্থিত হয়; শ্যামকান্তি নবজলধরের স্নিগ্ধকান্ত মনো-

মোহন মূর্ত্তি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নিদাঘের যজ্ঞানল তেমনি করিয়াই নির্ব্বাপিত করিবার জন্য পরিপূর্ণ শান্তিকুম্ভ হস্তে গভীর মন্দ্রে অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করে; কিন্তু হায়, একজনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাহার সবই ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রকৃতির এই আনন্দ-আয়োজন যে ব্যর্থ অপেক্ষাও ব্যর্থ!

যাহার চক্ষে জগৎ দেখিতাম, সে চক্ষু আজ নিমীলিত। যাহার মনের আনন্দ-আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া আমার অন্তরের সব অন্ধকার দূর করিয়া দিত, সে মন যে আজ তাহার দেহের সঙ্গে সঙ্গে ধূলি-ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাই প্রিয়বিরহদুঃখকাতরা প্রিয়ার অন্তর বাহির সব যে অমানিশার অন্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন। সুখ, আনন্দ, শান্তি ও সান্ত্বনা সব সেই পরলোক-প্রবাসীর পদপ্রান্তে গিয়া বারম্বার লুণ্ঠিত হইতে থাকে। ইহলোকের কিছুই আর তাহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে ক্ষণিক তৃপ্তিও দিতে পারে না। দুনিয়ার মালিকের মুকুটমণি রাজরাজেশ্বরী সর্ব্বসম্পদের একাধিকারিণী আনন্দময়ী মেহের-উন্নিসা জীবন থাকিতেও আজ প্রাণ-হীনা—রাজকান্তের বিয়োগদুঃখবিধুরা জগদালোকরূপিণী রূপময়ী মেহের বৈধব্যের শুভ্রাবরণমণ্ডিতা পাষাণ-প্রতিমা হইয়া গিয়াছে—প্রাণ থাকিলেও সে প্রাণে আজ আনন্দস্পন্দনের একান্ত অভাব।

স্বামিসঙ্গময় দিনের অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অদত্ত সেবা ও সাহচর্য্যের শত ক্রটির কথা আজ মনে আসিয়া পতিহীনার অন্তর কি ব্যাকুল বেদনায় অধীর হইতেছে, তাহা সেই সর্ব্বসৌভাগ্যবঞ্চিতা বিয়োগবিধুরা বিধবাই বলিতে পারে!

এত দুঃখের মধ্যেও স্বামীর শেষ-আদেশ পালনের প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া নূরজাহান নীরবে থাকিতে পারেন নাই। ভ্রাতা আসফ কর্ত্তৃক বুলাকীর রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া, সমস্ত অবস্থা বুঝিতে মেহেরের ন্যায় বুদ্ধিমতীর বিলম্ব হয় নাই। স্বামীর আদেশ মাথায় লইয়া নূরজাহান শহরিয়ারকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এবং লাহোরের রাজধানী অধিকার করিয়া বুলাকীর অভিযানের প্রতিরোধমানসে লাহোর দুর্গে সৈন্যসমাবেশ করতঃ দুর্গ নগর ও রাজ-সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার চেষ্টায় কায়মনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, অদৃষ্টনেমি কাহার অদৃশ্যহস্তে নিয়মিত হইয়া তাহার আবর্ত্তন পূর্ণ করে কে জানে! কিন্তু ইহা জানি যে, অসৌভাগ্যের দিনে সহস্র চেষ্টাতেও ভাগ্যদেবতার প্রসন্ন-হাস্য লাভ করা যায় না। পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতরণ আরম্ভ হইলে, শিখরীর পাদমূলে আসিয়া পতন অনিবার্য্যই হয়—তৃণ গুল্ম প্রস্তর বৃক্ষ বল্লরী যাহাই কেন আশ্রয় করি না, কিছুতেই আর

অধঃপতন নিবারিত হয় না, আশ্রয়কে লইয়াই ভূমি-শায়ী হইতে হয়। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব সহস্রকরে আকাশ আশ্রয় করিয়াও ঊর্দ্ধে আসন রক্ষা করিতে পারেন না; দিক্‌চক্রবালের অন্তরালে পড়িয়া তাঁহাকে দুর্ভাগ্যে আত্মগোপন করিতেই হয়,—ইহাই জগতের নিয়ম। কেবল নূরজাহানের ভাগ্যে অন্যরূপ হইবে, ইহা কি সম্ভব? কত ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ পাত হইয়া গিয়াছে; যে নিয়মে বিশ্বচক্র ভ্রাম্যমান্, তাহার অনু পরিমাণ ব্যতিক্রমও হয় নাই, হইবেও না।

মেহের-উন্নিসাকে তবুও ভাগ্যবতী বলিব; জীবন থাকিতে সে তাহার জীবনাধিকের স্নেহ-সাহচর্য্য-সান্নিধ্য পাইয়াছে, তাহার প্রাণপ্রিয় দয়িতকে সেবা সহানুভূতি শান্তি সুখ দিতে পারিয়া নিজের নারীজন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, এমন দুরদৃষ্টের সৃষ্টি জগতে হইয়াছে যে, যে দিন হইতে জীবনের আনন্দ-স্পন্দন সে অনুভব করিয়াছে, জীবনের সাফল্য কিসে এবং কোথায় জানিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতেই ব্যর্থতার বিন্ধ্যগিরিভার তাহার বুকে চাপিয়াছে, নিঃসঙ্গ দুর্ভাগার জীবনান্ত দিনের স্তিমিত-নেত্রে অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে তাহার জীবনের শেষ যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তখনও তাহার আরাধ্য সার্থকতা বহু—বহু দূরে!! স্পর্শমণির ক্ষণিক স্পর্শ যোড়করে যাচিয়া যাচিয়া জীবন শেষ হইয়া গেল,

ভাগ্যদেবতার প্রসন্নতালাভ অদৃষ্টে ঘটিল না—দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া কৃপার দান ভিক্ষা মাগিয়া সমগ্র জীবন কাটিয়া গেল, অনন্তপথের অনির্দ্দেশ-যাত্রার দিনে রিক্ত-মুষ্টি লইয়াই বিদায় হইতে হইল, এমন দুঃখী-জীবনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। দিনেকের সার্থকতার সুখ ও আনন্দ ক্রয় করিতে অবশিষ্ট জীবনের সব পরমায়ু আনন্দে দিতে পারিত, তবুও সে ক্ষণিকের সাফল্য-লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না, এমন ভাগ্যহীনের সংখ্যা জগতে কম নয়। সেই সকলের তুলনায় মেহেরকে সুখী বলিতেই হইবে। সুখ দুঃখ যে আপেক্ষিক শব্দ, তুলনায় ইহার পরিমাপ হইয়া থাকে। মেহের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই পায় নাই, সুখের মুখ দেখিয়া জীবন ধন্য করিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল।

শহরিয়ারের সিংহাসনারোহণের ঘোষণা বুলাকীর নিকট পঁহুছিলে, সসৈন্যে বুলাকী কেমন করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার অজ্ঞাতে শহরিয়ারের চক্ষু উৎপাটিত হইয়া তাহাকে এই চির-পরিচিতা স্নেহময়ী ধরণীর শোভাসৌন্দর্য্য দর্শনের সুখ হইতে চিরবঞ্চিত করা হইয়াছিল, কেমন করিয়া বুলাকীর দয়ার্দ্র হৃদয়ের করুণায় অন্ধ-রাজকুমারের জীবন রক্ষা হয়—সে সব কথা মোগল-ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। শহরিয়ারের পরাজয়ের পর সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের

শরীররক্ষী সেনা ভিন্ন আর সহায় ছিল না, প্রায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকের প্ররোচনায় সম্রাজ্ঞীকে যখন কারারুদ্ধ করিবার উদ্যোগ-অনুষ্ঠান চলিতেছে, তখন নূর-জাহান তাঁহার আত্মরক্ষাকল্পে একটিমাত্র পদাতিক সৈন্যও নিকটে না রাখিয়া, বুলাকীর হস্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন।

যে নূরজাহান তদানীন্তন ভারতের দুর্দ্দান্ত সেনাপতি রণপণ্ডিত মহব্বতের বিরুদ্ধে, ছত্রভঙ্গ সেনাদলের অবশিষ্ট লইয়া, নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে যুদ্ধোদ্যম করিতে ভীত হন নাই, ইতস্ততঃ করেন নাই, বরং বাদশাহী সেনানায়কদের ও ভ্রাতা আসফের ভীরুতার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া, স্বয়ং সৈন্যচালনার ভার লইয়া, বর্ষাস্ফীত দুরন্ত তরঙ্গিণীর মৃত্যুতরঙ্গের মধ্যে হস্তীসহ ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন—সেই নূরজাহান আজ বুলাকীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন কত বড় দুঃখে! সব আনন্দ যাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়া গিয়াছে, যাহার নেত্র-নিমীলনের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনবোধও ফুরাইয়াছে, সে দুঃখসার জীবনে কোন্ প্রলোভনে আর কর্ম্মের উদ্যম করিবেন! স্বামীর শেষ আদেশ পালন ও জামাতা শহরিয়ারকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ করিয়া কন্যার সুখ-কামনায় যেটুকু কর্ত্তব্য বাকী ছিল, তাহাতে অকৃতকার্য্য

হওয়ার পর আর বর্ষীয়সী বিধবার কর্ম্মস্পৃহা থাকিতে পারে ?

দুরন্তদুঃখের মধ্যে পথপার্শ্বে জন্মলাভ করিয়া, জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া কোথায় আগ্রা, কোথায় সুদূর বঙ্গদেশের পল্লী বর্দ্ধমানে আসিয়া জীবনের একাংশ সুখে দুঃখে কাটিয়া গিয়াছে—তারপর রং-মহলের দাসীবৃত্তি করিয়া কিরূপে হৃদয়ভরা স্নেহের বলে বল্লভতম প্রাণপ্রিয় দয়িতলাভে তিনি কৃতার্থ হন, সাম্রাজ্যের রথরজ্জু যখন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তখন কত প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, স্বামীর পানপ্রিয়তা নিবারণকল্পে কত লাঞ্ছনাই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, মহব্বতের হস্তে পতির দুর্গতি নিবারণ করিতে গিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পর্য্যন্ত নতশিরে বহন করিতে হইয়াছে, স্বামী-বিয়োগের পরে অষ্টাদশবর্ষব্যাপী বৈধব্য কি বিপুল ব্যথায় কাটিয়া গিয়াছে, সব কথা মনে করিলে,—নূরজাহানের বৈচিত্র্যময়ী জীবনকাহিনী হৃদয়ের মধ্যে আলোচনা করিলে,—পাষাণও বুঝি দ্রব হইয়া যায় !

আজ সে ভুবনবিখ্যাত মোগল-সাম্রাজ্যও নাই, সে দিনও নাই, সে দিনের নীতিও আজ কত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজকার দিনের য়ুরোপীয় সমাজ ও নীতিশাস্ত্রের মূলমন্ত্র মনে করিয়া, প্রাচ্যদেশের তিন-

শত বৎসর পূর্ব্বের নারী-চরিত্রের বিচার করিতে বসিলে, হয়ত বা নূরজাহানের চরিত্রে দুই একটি দোষ দেখা যাইতেও পারে, তবে সে বিচার ন্যায়বিচার হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিধবার বিবাহ মুসলমান শাস্ত্র ও নীতির বিরোধী নহে; জাহাঙ্গীরের অন্য পত্নী বিদ্যমানে তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকৃত হওয়া নূরজাহানের চরিত্রের কলঙ্ক নহে, কারণ একাধিক পত্নী এককালে গ্রহণ প্রাচ্যদেশে চিরপ্রচলিত প্রথা; আজও সেইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না। প্রাচ্য-দেশে সামাজিক নিয়ম যাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা হেতু-কারণ দেখিয়াই একাধিক পত্নীগ্রহণ পুরুষের পক্ষে নিষেধ করেন নাই। আজ য়ুরোপ আমাদিগকে মন্ত্রপূতা একটি মাত্র পত্নী গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছেন। প্রাচী ও প্রতীচির মধ্যে দেশগত, সমাজগত, প্রকৃতিগত কত বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্ববিষয়ে য়ুরোপের অনুকরণ করি,—ঠিক করি কি না কে জানে ?

নূরজাহানের সমসাময়িক, তাঁহার পূর্ব্বের ও পরের নানাদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সকল রমণীকে সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে হইয়াছে, বা যাঁহাদিগকে নিজ নিজ সম্রাট্-স্বামীকে রাজকার্য্যে সহায়তা করিতে হইয়াছে,

তুলনায় নূরজাহান তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কার্য্যপটুতা বা অন্যান্য গুণে হীন ছিলেন না। নারীর সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ তাহার রূপ। বিধাতা নূরজাহানকে রমণী-রূপের আদর্শ করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। যে সকল ঐতিহাসিক নিজ নিজ কল্পনাবলে নূরজাহানের নানা-রূপ দোষ ও অকীর্ত্তির অযথা প্রচার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহারাও নূরজাহানকে কুরূপা বলিতে সাহসী হন নাই। দিল্লীর রং-মহলকে রমণী-রূপের হাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জর্জ্জিয়া, সারকেশিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং ভারতের নানা প্রদেশাহরিত পরমসুন্দরী রমণীগণ বাদশাহের আজ্ঞায় রং-মহলে স্থান পাইত। আকবর শাহের পুত্র কন্দর্পকান্তি কুমার সেলিমের চিত্তবিনোদনের জন্য সুন্দরী রমণীর অভাব ছিল না, তথাপি প্রথম দর্শনমুহূর্ত্তে রাজনন্দনের হৃদয়ে যে কিশোরী তাহার অচল আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাকে রূপবতী বলিলে তাহার যথাযথ বর্ণন বোধ করি হয় না। তাহার রূপমাধুর্য্য যে অনন্য-সাধারণ ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে মোগল ও পারসিক রমণীদিগকে নানা যত্নে শিক্ষা দেওয়া হইত—এ কথার প্রমাণ নানা ইতিহাস হইতে দেওয়া যাইতে পারে। নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগ কন্যাকে পরম যত্নে সুশিক্ষিতা করিয়া-

ছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন; এবং নানা দেশ হইতে কবিগণ বেগম নূরজাহানের নিকট সমস্যাপূরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আসিতেন, এই একটি মাত্র ঘটনায় বোঝা যায় যে নূরজাহান কেবলমাত্র শিক্ষিতা ছিলেন না—তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁহার সূচী ও চিত্রশিল্পে নৈপুণ্য সর্ব্বজন-বিদিত, রং-মহলের দাসীবৃত্তির দুঃখময় দিনে ঐ শিল্প-নৈপুণ্যই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। নৃত্য গীত ইত্যাদি কলাবিদ্যায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পারসিকদিগের প্রথানুসারে গিয়াসভবনে আমন্ত্রিত রাজকুমার সেলিম যে মেহেরের নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই সংবাদ নানা অসম্ভব কাহিনীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যশাসনকালে নূরজাহান সর্ব্ববিষয়ে কি পরিমাণ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি; তাঁহার কার্য্যকুশলতায় রাজস্ব ও সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য তথ্য। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য জাহাঙ্গীরের পানাসক্তি তিনি কত পরিমাণে কম করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জাহাঙ্গীরের স্বরচিত জীবনচরিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। আপদ্‌গত স্বামীর উদ্ধারকল্পে, অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সৈন্য-চালনার ভার স্বীয় হস্তে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সাহসিকতা ও পতিপ্রেমের অমর উদাহরণ।

সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে যাঁহার পার্শ্বচরী হইয়াছি, যাঁহাকে জীবনের চিরসঙ্গীরূপে জীবনদেবতারূপে হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার জীবিতকালের যাবতীয় কর্ম্মে ও মর্ম্মে, তাঁহার শয়নে ভোজনে ভ্রমণে বিশ্রামে, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেক তুচ্ছতম কার্য্যেও যদি আনন্দবিধান করিতে না পারিলাম, তবে নারীত্ব, পত্নীত্ব দুইই ব্যর্থ। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে, মেহে-রের নারীজীবন ও পত্নীজীবন কিছুই ব্যর্থ হয় নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অবসান

স্নেহশালিনী রমণীর প্রেম এই দুঃখ-দৈন্য-জরা-মরণ-গ্রস্ত ধরণীর অসহায় মানবের হৃন্মর্ম্মব্রণের সুশীতল সুধালেপ ; ভাগ্যবান জাহাঙ্গীর সে সুধার আস্বাদ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মানবজীবনের চিরা-কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা, যাহা রাজজীবনে সুদুর্লভ, সে সার্থকতা জাঁহাপনা জাহাঙ্গীর তাঁহার চিরাভিলষিত আদর্শ রমণী মেহেরেরই হস্তে লাভ করিয়া তাঁহার জন্ম ও জীবন সফল করিয়া গিয়াছেন। বহু-বল্লভ নৃপতির ক্ষণিক প্রণয়ের সৌভাগ্যস্মৃতি লইয়া মেহেরকে অনাবশ্যক জীবন অনাদরের অন্ধকারে যাপন করিতে হয় নাই ; তাঁহার প্রাণাধিক বল্লভতম রাজকান্তকে যে অজস্র স্নেহ প্রীতি তিনি দান করিয়া তাঁহার রাজ-জীবন ও মানব-জীবন ধন্য করিয়া দিয়াছিলেন, রাজাধিরাজ জাহাঙ্গীরও স্বামীরূপে প্রণয়ীরূপে সে প্রেমের প্রচুর প্রতিদান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে চিন্তায় বৈধব্যের বিপুল বিরহের দিনে শান্তি সান্ত্বনা কি পাওয়া যায়? জীবনারম্ভের একমাত্র অভিলষিত, জীবনশেষের একমাত্র স্নেহাবলম্বন, প্রেম-পিঞ্জরের একমাত্র শুকবিহঙ্গ, হৃদয়-

পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যে দিন অনির্দ্দিষ্ট লোকান্তরের উদ্দেশে অনন্তকালের জন্য পলায়ন করে, চিরবিরহাতুর বিধবার পক্ষে সে দিন যে কি দিন, তাহা কেমন করিয়া বলি? সারা বুক ভরিয়া যে বাস করে, সারাদিনের কর্ম্মের মধ্যে যে বিরাজিত, সমস্ত দিন-রাত্রির চিন্তার মধ্যে যাহার অটল আসন স্থাপিত, সে আসন শূন্য হইলে, সে বুক খালি হইয়া গেলে কেমন হয়, তাহা, যাহার না হইয়াছে সে বলিতে পারে না; এবং যাহার হইয়াছে, সেও এক নিমেষে পাষাণ হইয়া যায়। সমস্ত বলার অতীত যে দুঃসহ দুঃখ, সে কথার বর্ণন কেমন করিয়া কে করিবে? পরমায়ুর যে কয়টা দিন দুঃখের ধরণীতে থাকিতে হইবে, তাহা থাকিতেই হয়, তবে কেমন করিয়া যে থাকে, তাহা সেই চিরদুঃখীর দুঃখময় দিনযাত্রার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়। মেহেরও সেইরূপ তাহার দারুণ দুঃখ-দিনের কিছু পরিচয় দিয়া গিয়াছে। আজ আর সে দিন নাই, রাজদণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, মহার্ঘ-মণিমণ্ডিত মুকুট আজ শিরশ্চ্যুত, একান্ত প্রিয়জনের স্বেচ্ছাদত্ত প্রেম-মন্দারমালা আজ কণ্ঠবিচ্যুত, ভারতপতি জাহাঙ্গীরের হৃদয়াশ্রিতা প্রেম-লতিকার মূর্ত্তিমতী আনন্দ-মঞ্জরী আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে, অনন্ত আকাশ-তলের রবি সোম শনি মঙ্গল বুধ শুক্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক

অবসান

এই ধরাধামের অসহায় নরনারীর অদৃষ্টের উপর আধিপত্য করিয়া, কখনও সুখ সম্পদ, কখনও বা দুঃখ দৈন্য দিয়া, আমাদের জীবন-যাত্রার কোন মতে শেষ করিয়া দেয়; এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অজ্ঞাত লোক-লোকান্তরের যাত্রী করিয়া আমাদিগকে অন্ধকার পথে বিদায় করে। সে কথা সত্য নহে। কোন্ অজ্ঞাত দেবতার আজ্ঞায় জানি না, এই ধরণীর একটি মানুষ আর একটি মানুষের অদৃষ্টের উপর একাধিপত্য করে। যতদিন সেই দৈব-প্রেরিত, অন্তরের অন্তরতম, একমাত্র শুভগ্রহের স্নেহ-হস্তের করুণ ছায়া ও প্রেম-সন্নত আনন্দদৃষ্টি আমাদের উপর অক্ষয় হইয়া থাকে, আকাশের জ্যোতিষ্কের খর-তাপ বা গ্রহের বক্রদৃষ্টি আমাদিগকে কোন দুঃখই দিতে পারে না। যে দিন প্রাপ্তকালে বা অকালে, সকারণে বা অকারণে, আমরা সেই শুভগ্রহের শুভদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হই, সে দিনের দুঃখ-বেদনার নিকট শনি বা অশনির ব্যথা কিছুই নহে। কিশোরী মেহের-উন্নিসার অনুত্তরঙ্গ স্তব্ধ প্রেমসাগরে ভারতাকাশের পরিপূর্ণ চন্দ্রমা কুমার সেলিম যে জোয়ারের বান ডাকাইয়াছিল, সে তরঙ্গ মেহেরের হৃদয়তটে আজীবন কেমন করিয়া কত আঘাত করিয়াছে, তাহা কেবল মেহেরই জানিত। জীবনসায়াহ্নে সে চাঁদের পরম স্নিগ্ধ প্রেমচন্দ্রিকা মেহেরের অতৃপ্ত হৃদয়ের ক্ষত বেদনার উপর কেমন করিয়া সুধালেপ দিয়া শান্ত

করিয়াছিল, তাহা মেহেরই জানিত। আজ সে হৃদয়-চন্দ্রমা অস্তশিখরীর পরপারে চিরদিনের জন্য লুকাইয়া মেহেরকে কি অপার দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাও মেহেরই জানে।

এ জীবনের একান্ত আবশ্যকীয়, অন্তরের প্রিয় মানুষটির স্নেহলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। নৈরাশ্যের মধ্যে জীবন আরম্ভ করিয়া, নৈরাশ্যেই তাহার অবসান হইবে ভাবিয়াছি, তখন যদি চিরারাধ্য চিরাভিলষিত নয়নাভিরাম মনের মানুষটি জীবনভরা নিরাশার দুঃখ মিটাইয়া দেয়, সে যে কত বড় সুখ, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? তাহার পরেও যাহার দগ্ধভাগ্য প্রতিকূল হইয়া, সুচিরলব্ধ একান্তবাঞ্ছিত চিন্তামণিহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লয়, সে দুঃখ রাখিবার স্থান ত্রিভুবনে মেলে কি? সে দিনে এই আকাশভরা আলোক এক নিমেষে কেমন করিয়া নিবিয়া যায়, দক্ষিণাপথের মন্দ মলয়মারুত কেমন করিয়া বিষদিগ্ধ হইয়া উঠে, নিকুঞ্জের পুষ্পমঞ্জরী এক পলে কেমন করিয়া বিফল হয়, বসুধার বনবৈতালিকের কলগীতি কেমন করিয়া নিঃশেষে তাহার মাধুর্য্য হারায়, বসন্তের ঘনশ্যামতৃণাস্তীর্ণ কুঞ্জবীথিকা কেমন করিয়া আরব সাগরের বালুবেলায় পরিণত হয়, সমগ্র জীবন কেমন করিয়া দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, পলে পলে কেমন করিয়া যে মরণ যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহা কেমন করিয়া

বলি ? প্রাণ-প্রিয় ধনকে কেমন করিয়া সুখী করিব, কি করিলে তাহার মুখে আনন্দের হাস্যমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে, আমার সব দিয়া তাহার সব দৈন্য কেমন করিয়া মিটাইব, এই চিন্তায় যাহার দিনরজনী ভরিয়া ছিল, হঠাৎ একদিন এক নিমেষে সে সুখচিন্তার নিকট হইতে বিদায় পাইলে, সে বিদায়ের নিদারুণ অদৃশ্য শেলাঘাত যে শত শক্তিশেলের মত হৃণ্মর্ম্মের উপর লক্ষ ছিদ্র করিয়া, অসহ বেদনায় সমস্ত অন্তরকে কেমন করিয়া মূর্চ্ছিত করে, তাহা যাহার করে সেই জানে, কিন্তু সে ব্যথা বলিবার ভাষা কি আছে ?

এ যে দিনের কথা, সে দিনে মোগল-সাম্রাজ্য ধন-সম্পদ বল-বীর্য্য গৌরব-গরিমায় জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল ; সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীর যেখানে যে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্য ছিল, দিল্লী-সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা সম্রাটের পাদপীঠতলে সমস্তই আসিয়া লুণ্ঠিত হইত ; চিরধৈর্য্যময়ী ধরিত্রী বুক চিরিয়া তাহার গোপন খনির রক্তমাণিক রাজচরণে উপহার দিত ; অতলস্পর্শ জলনিধি, রসাতলচারিণী রূপকথার রাণীর কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া আনিয়া সম্রাজ্ঞীর কম্বুকণ্ঠের চারু-ভূষণ গড়িয়া দিত ; অলকার ন্যায় গোলকুণ্ডার অফুরন্ত ভাণ্ডার সে দিনে রাজকোষ পূর্ণ করিয়া আজও শূন্য হইয়া বসিয়া আছে : দেশ দেশান্তর হইতে সমাহৃত

'কোহিনূর', 'দরিয়ানূর' প্রভৃতি অমূল্য মণি দেশ দেশান্তরের কত 'নাদির', কত 'আব্‌দালী'র কত আবদারই যে কত দুঃখে পূর্ণ করিয়াছে! কত দিগ্‌-দিগন্তরের দিগ্বিজয়ী রাজার রাজদূত দিল্লী-সিংহাসনের পাদপীঠতলে কত বৎসর বৎসর যাপন করিয়াও অভিলষিত বরলাভ করিতে পারে নাই। এ হেন ইন্দ্রতুল্য চক্রেশ্বরের প্রিয়তমার সুখসমৃদ্ধি উন্মাদ কল্পনারও অতীত। সেই স্বপ্নাতীত সুখস্বর্গ হইতে এক নিমেষে বিচ্যুতা হইয়া যে নারী ধরণীর ধূলিতলে মিশাইয়া যায়, সে দুঃখ-বেদনার নিকট বজ্রবেদনাও কি লঘু নহে? যাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য এবং অপার প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছি, তাহার ক্ষণবিরহেই পাগল হইতে হয়। পরলোকপ্রবাসী সেই প্রিয়জনের চিরবিরহ 'অসহ্য', এ কথা বলিলে কিছুই বলা হইল না।

জাহাঙ্গীরের অবসানের পর কি বেদনায় মেহেরের দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কাটিয়াছে, তাহা সমদুঃখীর কল্পনার সামগ্রী—কোন লেখকের বর্ণনার জিনিষ নহে। জাহাঙ্গীরের বিয়োগ মেহেরের পক্ষে কেবল পতি-বিয়োগ নহে—পিতামাতার প্রতিকূলতায়, রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ আক্‌বর শাহের অনুজ্ঞায়, পরম প্রেমে যাহাকে জীবনপ্রভাতে হৃদয়ে স্থান দিয়াও বুকের কাছে পাই নাই, জীবন-সন্ধ্যায় তাহাকে দিনরাত্রির সহচরস্বরূপ



পাইয়াও হারাইলাম, এ বেদনার সঙ্গে কোনও বেদনার তুলনা হয় কি? সমগ্র জীবনকাল যাহাকে পাইবার জন্য আকাশের সকলগুলি দেবতার কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানাইয়াছি, তীর্থমন্দিরের দ্বারে দ্বারে বাঞ্ছিতলাভের জন্য মনে মনে কত মানতই করিয়াছি, জীবনশেষে তাঁহাকে পাইয়াও রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার স্নেহকোমল বক্ষে মাথা রাখিয়া নয়নের শেষ-নিমেষপাত করিবার অবসর আমার হইল না, অন্তিম দিনে যখন পথের উপর আমার শেষ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন আমার একান্ত প্রিয়, প্রাণাধিক নয়নমণি, জীবিতাবলম্বন, যে আমার সকল বাড়া, অন্তরতলে চরম দেবতার আসনে যাহাকে পরম প্রেমভরে বসাইয়াছিলাম, আকুল নয়নে খুঁজিয়া তাহার সাক্ষাৎ আর জীবনে পাইব না,—এ দুঃখ যাহার ঘটিয়াছে, সে ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে? চক্ষুতারকার সহিত যে মিশিয়া ছিল, সে চলিয়া গেলে চক্ষু অন্ধ হয়, দেহমনে যাহার প্রেমস্পর্শ বাসন্তীলতিকার মত অন্তরে বাহিরে আমাকে মঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার অভাবে একমুহূর্ত্তে পাষাণ হইতে হয়;—মেহের ইন্দ্রিয়হীনা অন্ধ পাষাণী হইয়াই অষ্টাদশ বর্ষ যাপন করিয়াছে।

মেহেরের প্রতি জাহাঙ্গীরের জীবনভরা প্রেম কেবল সোহাগ আদরেই পর্য্যবসিত হয় নাই, বাদশাহের কৃপায়

মেহের হিন্দুস্থানের যথার্থ সম্রাজ্ঞী হইয়াছিল এ কথা আমরা জানি। বাদশাহের জীবনান্ত হইবার পর যাহাতে সম্রাজ্ঞীর অশন-বসনের কোন ক্লেশ না হয়, তাঁহার অভাবের পর যে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিয়াই বিধবা সম্রাজ্ঞীর পদমর্য্যাদার অনুরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্বর্ণপ্রসূ গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যমণিস্বরূপ আহ্‌মেদাবাদের সমস্ত রাজস্বও যাহাতে মেহেরের করায়ত্ত থাকে, সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন।

হায়রে, যাহার সব ফুরাইয়া গিয়াছে, জীবন যাহার নিকট দুর্ব্বহ, অশন-বসনের সৌকর্য্য তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবে? বৈধব্যের নিদারুণ দুঃখাভিঘাতে মেহেরের মন দীনবন্ধুর চরণে শরণাপন্ন হইয়াছিল, যাঁহার দত্ত জীবন তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়া দিয়া মেহের প্রতিদিন শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল, তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি কিছু ছিল? বাদশাহ-দত্ত বৃত্তির অতি নগণ্য অংশে তাহার এক সন্ধ্যার হবিষ্যান্নের ব্যয় কুলান হইত, বাকী সমস্ত অর্থ সরাই মসজিদ কূপ কবর প্রভৃতি নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া, নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া, গৃহহীনের শেষ শয়ন বিছাইবার উপায় করিয়া দিয়া, বিধবার বিপুল দুঃখের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শুভ্রবসনধারিণী

শুভ্রায়িতকেশা বর্ষীয়সী বিধবা নূরজাহানকে দেখিয়া সে দিনে কে বলিবে এই সেই কিশোরী মেহের, জীবন-বসন্তের এক শুভসন্ধ্যায় দীপালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে যাঁহার বিলোলাপাঙ্গ-নির্জ্জিত হইয়া জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীর একদিন তদীয় রক্তকোকনদ পদে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে একদিনের জন্যও লাভ করিতে পারিলে জীবনের বাকী পরমায়ুর সব কয়টা দিন অকাতরে দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, স্বামীর রক্ষাকল্পে অসীম বিক্রমশালী সেনাপতি মহব্বতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসে বর্ষাস্ফীতা পার্ব্বত্য-তরঙ্গিণীর মৃত্যুতরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই; কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, যাঁহার রাজকার্য্যকুশলতায় মোগল সাম্রাজ্যের অর্থ-ঐশ্বর্য্য গৌরব-গরিমা বল-বীর্য্য সমস্তই একদিন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, যাঁহার সহিত তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশের কোন সম্রাজ্ঞীই কোন গুণেই সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও অতি বিরল। হায় রে, আমার প্রাণাধিক প্রিয়জনের নয়নের সম্মুখে, তাহার স্নেহস্পর্শে, তাহার সোহাগ আদরের মধ্যে, তাহার দিনান্ত-ক্ষণদর্শনের আনন্দে আমি যাহা, তাহার নয়নান্তরালে, তাহার স্নেহবিচ্যুত হইয়া, তাহার

সান্নিধ্য সাহচর্য্য সঙ্গ হারাইয়া আমি কি তাই? প্রেমের সঙ্গে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাণ যায় না, তাই ছায়ামাত্রাবশিষ্ট কঙ্কালসার দেহভার বহিয়া, পথে প্রান্তরে অনাবশ্যক উদ্দেশ্যহীন বন্ধনবিহীন জীর্ণ জীবন কোন মতে যাপন করিতে করিতে অন্তিম নিষ্কৃতির দিনের অপেক্ষা করিতে হয়; নতুবা আজ মরিতে পাইলে, পরদিবসের জন্য অপেক্ষা কি কেহ করে, না করিত?

জাহাঙ্গীর দিল্লী বা আগরায় অধিক সময় থাকিতেন না, লাহোর আজমীর এবং কাশ্মীরে তাঁহার বেশী সময় কাটিত। বাদশাহের দিন-যামিনীর অবিচ্ছেদ-সঙ্গিনী মেহের-উন্নিসা স্বামীসান্নিধ্যের আনন্দলোভে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেন। বৈধব্যের বিপুল বেদনার দিনেও বাদশাহের প্রিয় রাজধানী লাহোরেই মেহের তাঁহার পরম দুঃখের দিনযাত্রার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহার আরও একটি কারণ ছিল। জাহাঙ্গীর শাহের পার্থিব দেহাবশিষ্ট লাহোরে শাহদারায় সমাহিত করা হইয়াছিল। মর্ম্মরনির্ম্মিত অনিন্দ্যসুন্দর এই মৃত্যুমন্দিরের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া মূর্ত্তিমতী বেদনা মেহের-উন্নিসা তাঁহার প্রিয়-বিরহের দারুণ দিনগুলি কোন মতে যাপন করিতেন; এবং তদানীন্তন সম্রাট্ শাজাহানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তাঁহারও জীবনাবসানে, সমগ্র

জীবনের একান্ত কামনার প্রিয়তম ধন, ব্যর্থপ্রায় জীবন-অপরাহ্নের সর্ব্বসার্থকতার নিদান ও সুখ-শান্তি-বিধাতা বাদশাহের পার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। একান্ত স্নেহমুগ্ধ জনের মনের এ ইচ্ছা বড়ই স্বাভাবিক ইচ্ছা; অশরীরী দেবতার মোহন-মন্ত্রবলে প্রথম দর্শনের দিনেই যাঁহাকে অন্তরের নিভৃত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহার পরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের কণ্টকময় দুঃখপথে বিচরণ করিবার সময়ে যে অভীষ্টের প্রতি সূর্য্য-মুখী পুষ্পের ন্যায় উন্মুখী হইয়াই দিন কাটিয়াছে, বিগত-প্রায় বাসরে দু'দিনের সঙ্গ সাহচর্য্য পাইয়াও প্রতিক্ষণে উপচীয়মান প্রেমামৃতের অজস্রধারায় যাঁহার মনোভিমত তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া দিবার অবসর এবং অদৃষ্ট আমার হইল না, লোক-লোকান্তরে তাঁহাকে পাইবার তপস্যা না করিয়া, তাঁহার সমাধিভবনের প্রতি সাশ্রুনয়ন বারম্বার না ফিরাইয়া, তাঁহারই দেহাবশিষ্টের নিকট সমাহিত হইবার বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া কি থাকা যায়?

মেহের-উন্নিসা বিদুষী ছিলেন, বুদ্ধিমতী ছিলেন, কবি ছিলেন—যাহাই কেন থাকুন না, সর্ব্বোপরি তিনি মানুষ ছিলেন। তাঁহার অনবদ্যসুন্দর দেহের অভ্যন্তরে অপরিমেয় স্নেহভরা মানবীর মন ছিল; সে মন প্রথম-জীবনে মনচোরের সহিত প্রথমদর্শন দিনে, জীবনের

প্রথমানুভূতির দিনে অপহৃত হইয়াছিল এবং সে মনচোর ভারতের ভাবী সম্রাট্ ভুবনৈকসুন্দর কুমার সেলিম। সব্যসাচী অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত বজ্রসার লৌহশায়ক যেমন বসু-ধার বক্ষ বিদারণ করিয়া রণক্লিষ্ট যোদ্ধার তৃষ্ণার তৃপ্তি-রূপিণী ভোগবতী ধারার সৃজন করে, অনঙ্গদেবতার কর-ক্ষিপ্ত প্রথম পুষ্পশায়ক তেমনি মেহেরের হৃদয়পদ্মের মধুকোষ ভেদ করিয়া তাহার রাজকান্তের সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা-নিবারণক্ষম অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সুধাশীতল প্রেমরসের সৃজন করিয়াছিল। কিন্তু রাজরাজের দুর্ভাগ্য যে, যথাসময়ে সে সুধার আস্বাদ পাইয়া তাঁহার মানবজীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে নাই; মেহেরেরও দুর্ভাগ্য যে, জীবনসন্ধ্যায় যতটুকু তৃপ্তিদান করা সম্ভব, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা আশ্বাস শতবার করিয়া দিয়া নিয়াও সে সাধ মিটাইবার যথেষ্ট সময় হইল না। যে দিনে সেবা সাহচর্য্য সান্নিধ্য সঙ্গের বড় প্রয়োজন, সে দিনে তাঁহার মানসবিহারী রাজাধিরাজ, তাঁহার প্রিয়দয়িত, তাঁহার একান্তবাঞ্ছিততম রাজকান্ত, তাঁহার জীবনবান্ধব পথের ধূলার উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অফুরান পথের পথিক হইয়া বাহির হইলেন। অতৃপ্ত তৃষার্ত্ত ক্ষুধিত হৃদয় লইয়া যে নারীকে আরও কিছুকাল এ সংসারে দুঃখের দিন যাপন করিতে হইয়াছিল, সে দিন যে কেমন করিয়া গিয়াছে তাহা সেই জানিত এবং তাহারই মত দুঃখিজনে

জানে—অন্তর্য্যামী জানেন কি না সে কথা কে বলিয়া দিবে ?

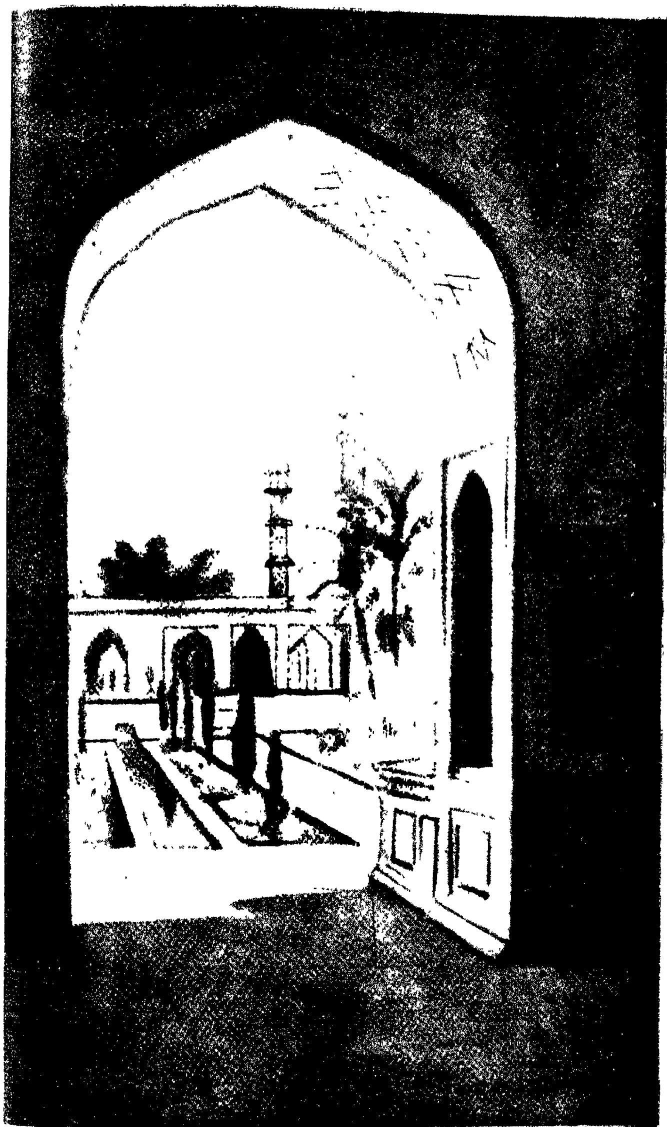
এই প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতরা চিরবিরহিণী বিধবার বিপুল দুঃখের দিনে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্ব কিছুই তাঁহাকে কোন শান্তি বা সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি তাঁহার শেষ নিষ্কৃতির দিনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া ছিলেন; এবং দুর্ব্বার মনঃক্লেশের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের অক্ষরে যে সকল কবিতা সময়ে সময়ে তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই একতম আজও আমরা তাঁহার সমাধির উপরে দেখিতে পাইয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারি না।

"বর্‌মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে,
না পরে পর্‌ওয়ানে আয়েদ্‌ না সদায়ে বুল্‌বুলে।"

হায়রে, সাগরান্তা ধরিত্রীর একাধীশ্বর জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের বাঞ্ছিততমা প্রিয়তমা প্রাণতমা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী প্রেমাশ্রিতা দয়িতার সুখদুঃখময় সুদীর্ঘ জীবনের পরিণাম কি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস!

জীবনের প্রথম-প্রভাত-অরুণোদয়ে, যৌবন-বসন্তের প্রথম দক্ষিণানিল-স্পর্শে তোমার ঈষদুদ্ভিন্ন-মঞ্জরী হৃদয়বল্লরী তাহার আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়কে নিকটে পাইয়াও তাহাতে ভর করিয়া শোভা সৌন্দর্য্য সুখে ও সুষমায়

সার্থক হইতে পারে নাই, নানা বাধাবিঘ্নময় সংসারের কণ্টকপথে রুধিরাক্ত পদে চলিয়া দিনান্তের ঘনায়মান অন্ধকারের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দু'দণ্ডের মিলনে তোমার কোন তৃপ্তিই হয় নাই; জীবনে জীবিতনাথের সহিত তোমার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত অবিচ্ছেদমিলন ঘটিবার পূর্ব্বে অপার অশ্রুনদী অনেক দুঃখে তোমাকে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইয়াছে, সুচিরাগত সেই মিলনও যে কত আয়াসলব্ধ তাহা কেবল তুমি জানিতে, আর জানিতেন তোমার চিরারাধ্য হৃদয়দেবতা জগৎপতি জাহাঙ্গীর; জীবনান্তে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ানিষ্পন্নের স্থান টুকু লইয়াও সংসার তোমাকে নিদারুণ দুঃখ দিতে ছাড়ে নাই; শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, জীবন-মরণের সন্ধিমুহূর্ত্তে, ইহজীবনের শেষতম নিমেষপাতের সময়ে নিজের শবদেহের জন্য প্রিয় দয়িতের সমাধিপার্শ্বে সামান্য স্থানটুকু পাইবার যে অন্তিম যাচ্ঞা করিয়া গিয়াছ, হায়রে, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা প্রাণতমা বাঞ্ছিততমা দয়িতা হইয়াও তোমার জীবনান্তকালের সে প্রার্থনাটুকু আজিও পূর্ণ হয় নাই। এই দুঃসহ দুঃখ কেবল তোমার নহে, হৃদয়নন্দনের আশা-মঞ্জরীগুলি একমাত্র তোমারই দুরদৃষ্টে ভূমিশায়ী হইয়া তাহাদের ব্যর্থ জীবন শেষ করে নাই, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে এ জগতে



শাহজাদী

অনেক দুর্ভাগা ছিল এবং আজও আছে যাহারা অশ্রু-জলের পঙ্কতলে তাহাদের করায়ত্ত সিদ্ধিকে অনিচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া অবশিষ্ট জীবন-কালের প্রতি-দিবস কেবল শেষের দিনের আগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

হে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদি-সৃষ্টি-স্বরূপিণী চির-দুঃখিনী মেহের, এ সংসারে যাহা পাও নাই, এ জীবনে যাহা হয় নাই, লোক-লোকান্তরে তাহা প্রাণ ভরিয়া পাইও, জন্ম-জন্মান্তরের সেই অখণ্ড মিলনানন্দের দিনে যেন প্রাণ ভরিয়া বলিতে পার—

"রয়েছ নয়নে নয়নে

*　　*　　*　　*

তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধি

লাহোর নগরে আপামর-সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধিভবন "শাহদারা"র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি প্রচলিত আছে। আমি একাধিকবার লাহোরে গিয়া বহুলোকের মুখে ইহা বারম্বার শুনিয়াছি। রাজাধিরাজের প্রিয়দয়িতার জীবন-মরণের এই ক্ষুদ্র কাহিনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, সেই সকল পাঠক পাঠিকার নিকট জনসাধারণ্যে প্রচলিত এই গল্পটি অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে, এই বিবেচনায় উহা এই-খানে বিবৃত করিতেছি :—

রাজরাজেশ্বরী নূরজাহান মৃত্যুর পূর্ব্বে সপত্নীপুত্র সম্রাট্ শাজাহান ও সম্রাটের সচিববর্গের নিকট তাঁহার শবদেহ শাহদারায় স্বামীর সমাধির একপার্শ্বে প্রোথিত করিবার একান্ত মিনতি বারম্বার নির্ব্বন্ধ সহকারে জানা-ইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পর সেই প্রেমমুগ্ধা রমণীর অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কোন উদ্যোগই কেহ করেন নাই—শাহদারায় তাঁহার শবদেহ প্রোথিত না করিয়া তাহারই অনতিদূরে একটি শ্রীহীন দীন সমাধিমন্দিরে জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের

প্রাণপ্রিয়া মহিষীকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল—মৃত্যুপথযাত্রিণী মেহেরের ইহলোকের শেষতম সামান্য কামনাও যে পূর্ণ হইতে পারে নাই একথা লাহোরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে।

সমাধিমন্দির পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত নহে। মন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচনে স্থপতির স্বেচ্ছাকৃত কৌশল ছিল কি না সে কথা আজ বলা কঠিন; কিন্তু ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, দিবসের ষষ্ঠ যাম হইতে দিননায়কের অস্তাচল-অন্তরালে অন্তর্দ্ধানের কাল পর্য্যন্ত, সম্রাটের সমাধিভবন মর্ম্মর-নির্ম্মিত শাহদারার ছায়া মেহেরের ক্ষুদ্র সমাধিমন্দিরের উপরে পড়িয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। লাহোর জনপদের জনসাধারণের ধারণা যে, সংসারের নির্দ্দয় চক্রান্তে যেমন সেলিম-মেহেরের মিলন বহু বিলম্বিত হইয়াও, সকল মিলন-বিরহের বিধাতা প্রেমদেবতার কৃপায় সে মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত জীবনশেষে সমুপস্থিত হইয়া শারদসন্ধ্যার বর্ণবৈচিত্র্যোজ্জ্বল পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের ন্যায় উভয়ের আয়ুরপরাহ্লকে আনন্দোজ্জ্বল করিয়াছিল, তেমনি পতি-গতপ্রাণা প্রেমমুগ্ধা মেহেরের অন্তিম ইচ্ছা মানুষে অপূর্ণ রাখিবার শত চেষ্টা শতপ্রকারে করিলেও, সর্ব্ব-লোকলোকান্তরের মহেশ্বর, সর্ব্বান্তরাত্মদৃক প্রেমের ভগবান তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। শাহানশাহ

সম্রাট্ জাঁহাপনা জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবমানে রাজ-কার্য্যের অবসানে প্রতি অপরাহ্ণে যেমন প্রিয়তমা প্রাণ-তমা দয়িতার আনন্দময় শুদ্ধান্তঃপুরে বিশ্রামার্থ গমন করিতেন, তেমনি প্রণয়শালিনী প্রাণাধিকা মেহের-উন্নিসার মরণান্তের মর্ম্মান্তিক মিলনেচ্ছা তাঁহার সমাধি-শয়ন হইতে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া, প্রিয়তমজনের সে ইচ্ছা আজ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছেন—কায়ার অভাবে আজ ছায়াময় দেহেও প্রেমবিমুগ্ধ রাজদম্পতীর মিলন-মহোৎসবের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না, লাহোরবাসী জনগণের আজ পর্য্যন্ত ইহা দৃঢ় বিশ্বাস।

পতিবিয়োগবিধুরা বিধবা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাটের সমাধিভবন শাহদারার একপ্রান্তে তাঁহার দেহাবশিষ্ট প্রোথিত করিবার প্রার্থনা বারম্বার জানাইয়াছিলেন, কিন্তু জগৎপ্রখ্যাত জাহাঙ্গীরের জীবিতরূপিণী মহিষীর এই সামান্য ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হইতে পারে নাই। জাহা-ঙ্গীরের আত্মজ ও উত্তরাধিকারী, তদানীন্তন সম্রাট্ শাজাহান বিমাতার এই অন্তিম ইচ্ছাটুকু পরিপূর্ণ করি-বার ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। জাহাঙ্গীরের জীবমানে যাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় ভারতের ত্রিংশৎকোটি নরনারী সিংহাসনের পাদপীঠতলে যোড়করে অপেক্ষা করিত, যাঁহার ক্রোধারুণ নয়নের বিস্ফুলিঙ্গপাতে সমগ্র ভারতের প্রাক্তনপত্র একদিন

পুড়িয়া ভস্মশেষ হইয়া যাইতে পারিত, যাঁহার ইঙ্গিতে একদিন ভারতসম্রাটের জগজ্জয়ী চতুরঙ্গবাহিনী বর্ষা-বিস্ফারিতা স্রোতস্বিনীর মৃত্যুতরঙ্গমধ্যে জীবন তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতে দ্বিধা করিবার সময় ও সাহস পায় নাই, যাঁহার ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় দেশদেশান্তরের রাজদূতগণ তাহাদের দূরাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে বিফল-মনোরথ হইয়া একদিন ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, যাঁহার কৌশলে ও বলে মহাবীর মহব্বতের মহাবীর্য্য একদিন নিষ্ফল হইয়া ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হইয়াছে, —রাজরাজের সেই দ্বিতীয় হৃদয়রূপিণী, চিরপ্রিয়তমা দয়িতার সমস্ত হৃদয়-মনের সকরুণ প্রার্থনাটুকুর পরিপূরণ স্বামীর দেহাত্যয়ের পরে আজ আর সম্ভব হইল না! হায় রে, "যাহার গরবে গরবিণী", সেই পরমধনের অভাবে সকলেরই বুঝি এই দশা হয়! একজনের স্নেহাপ্লুত-হৃদয়ের উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কালে সমস্তই সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু আজ শত চেষ্টায় শত আরাধনায় লক্ষ প্রার্থনায় তাহার শতাংশও সম্ভব হয় না! অমিত-বলশালী মহাকাল অদৃশ্যে বসিয়া মানবের অদৃষ্টচক্র এমনি করিয়াই বুঝি আবর্ত্তিত করিতেছেন!

মর্ম্মরবিনির্ম্মিত সুন্দর সমাধিমন্দিরে মৃত্যুর পরে স্থান পাইবার জন্য কি নূরজাহান আকিঞ্চন প্রকাশ করিয়াছিলেন? গভীর সপ্তসাগরের অপার ও অতল-

স্পর্শ অম্বুরাশি আলোড়ন করিয়া যাঁহার কম্বুগ্রীবার শোভাসম্পাদনার্থ শুক্তিগর্ভের অমূল্য মুক্তাদাম নিত্য আহরিত হইত, ধরণীর অন্ধগর্ভ বিদারণ করিয়া মণি-মাণিক্যের স্তূপ যাঁহার চরণতলে অনিবার উপহৃত হইত, তিনি তাঁহার জীবনহীন দেহকে মর্ম্মরাচ্ছাদিত করিবার গৌরবগরিমার জন্য শাহদারায় সমাধি পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন একথা নিতান্ত বর্ব্বরেরই মনে আসিতে পারে। যে জীবনাধিক প্রিয়-ধনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য একমনে কামনা করিয়া মেহেরের কৈশোর ও যৌবন ব্যর্থতার অতিদুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল, জীবনশেষের ঘনায়মান অন্ধকারা-চ্ছন্ন দিনে আকৌমারবাঞ্ছিত যে প্রিয়দয়িতকে চির-বুভুক্ষিত প্রেমের আকুল পরিবেষ্টনের মধ্যে পাইয়াও আমার জীবনের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, যে চিরাকাঙ্ক্ষিত রাজকান্তের স্নেহক্রোড়ে মরণাহত মস্তক রাখিয়া, সমাসন্ন বিয়োগব্যথায় তাঁহার বিষণ্ণ মুখ ও অশ্রু-আকুল নয়নের প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে মৃত্যুর অন্ধকারপথে অনির্দ্দেশযাত্রায় বাহির হইবার আমার অন্তিম কামনা বিধি-বিড়ম্বনায় পরিপূর্ণ হইতে পারিল না—সেই চিরপ্রেমের অমূল্যনিধি, মেহেরের নারীজীবনের স্পর্শমণি, কামনার অব্যয় সম্পদ সম্রাটের পার্শ্বে মরণান্তে একটুকু স্থান যে কি অনির্ভিন্ন

গভীর প্রেমের প্রেরণায় রাজমহিষী তাঁহার বৈধব্যের অসৌভাগ্যের দিনে কাঙালের মত প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানিতেন ; কিন্তু হায়, অপরে তাহা বুঝিল না, কিম্বা বুঝিয়াও প্রিয়সান্নিধ্য-বিচ্যুতজনের অন্তিমের ঐকান্তিক ইচ্ছার সম্মান রক্ষা করিয়া হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না !

ইহসংসারে অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে একের বেদনা অপরে বুঝিতে পারে না ; শোণিত-সংশ্রবশূন্য অবান্ধবজনের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নিকটবর্ত্তী পরমাত্মীয়জনের নিকটেও হৃদয়-বেদনার কোন মূল্যই নাই ; সমস্ত বিশ্ব বিমুখ হইলেও যেস্থান হইতে সহানুভূতির অমৃতস্পর্শলাভে বিপুল বেদনায় আতুর হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি পাইবে বলিয়া বড় আশা করিতেছি, কার্য্যকালে দেখিতে পাই সে আশা দুরাশা অপেক্ষাও ব্যর্থ !

মেহের-উন্নিসার জীবনসর্ব্বস্ব জাহাঙ্গীর বাদশাহ যে দিন ইহলোকের সকল সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়া বৈতরণীর পরপারে যাত্রা করিলেন, সেই দিন হইতে মেহেরের জীবিতপ্রয়োজন শেষ হইয়া গেল ; তাহার ছায়াচ্ছন্ন জীবন-সায়াহ্নের বিমলিন দিনগুলির উপরে প্রাণপ্রিয় দয়িতের অবিচ্ছেদ মিলন-সুখের রবি-রশ্মিরেখা পড়িয়া যে সমুজ্জ্বল বর্ণবিভা বিকীরণ করিতে-

ছিল তাহা সেইদিন হইতে চিরান্ধকারের মধ্যে চির-দিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। গোধূলির সীমন্তমণি দিন-মণি অস্তাচলের অন্তরালে ডুবিয়া গৈরিকাঞ্চলা সন্ধ্যা-সুন্দরীকে যেমন চিরতিমিরাবৃতা করিয়া যায়, জাহা-ঙ্গীরের জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইয়া মেহেরের অন্তর বাহির তেমনি করিয়া অন্ধকারাবৃত করিয়া গেল। রাজরাজের দেহাবশেষ যখন ধরিত্রীর অন্ধকার বক্ষতলে সমাহিত করা হইল, নিতান্ত স্নেহমুগ্ধা মমতাময়ী মেহেরেরও সেইদিন জীবন্ত-সমাধি হইয়া গেল। সেদিন মেহেরের সম্মুখে সমাধিগহ্বরের নিবিড় অন্ধকার, অশ্রুজলপ্লাবনে নয়ন অন্ধ, অবশিষ্ট জীবনকালের ভবিষ্যৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, হৃদয়চন্দ্রমার অস্তগমনে বেদনাতুর বক্ষ দুঃসহ বিরহের তমঃসাগরে একান্ত নিমজ্জিত ;—অন্তর বাহিরে সেদিন মেহের কি অন্ধকার দেখিয়াছিল তাহা সেই বলিতে পারে! এই একান্ত বিরহের সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া মেহের যখন তাহার প্রিয়বন্ধু প্রাণসর্ব্বস্বধন জাহাঙ্গীরের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিল, সেদিন তাহার কি দিন গিয়াছে তাহাও সে ভিন্ন আর কে বলিবে? এই পরমতম দুঃখের অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নিতে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ আনন্দ, ইচ্ছা অভিলাষ সমস্তই নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্মশেষ হইয়াছিল, আর সেই



দগ্ধ আশার ভস্মলেপে তাহার অবশিষ্ট জীবনকালের সঙ্গহীন অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন দিনগুলির স্বপ্ন এবং জাগরণকে কেমন করিয়া বিমলিন করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেবল মেহেরের বিধাতা যিনি, তিনি ভিন্ন আর কে জানিবে ?

জননীর সমভিব্যাহারে মোগলবাদশাহের অন্তঃপুরে মেহের যখন প্রথম গিয়াছিল, সহস্রদীপালোকিত সেই সন্ধ্যার পরম মুহূর্ত্তে ইন্দ্রভবনতুল্য 'রঙ-মহলের' সুসজ্জিত কক্ষে শাহজাদা সেলিমের সহিত সেই তাহার প্রথম 'শুভদৃষ্টি'; সেদিনে সমাসন্নযৌবনা সুন্দরী মেহেরের অরুণালোকোদ্ভাসিত মেঘনির্ম্মুক্ত বসন্তপ্রভাতের ন্যায় লোকদুর্ল্ভ সৌন্দর্য্যের পাদপীঠ-তলে ভারতের ভাবী সম্রাট্ তাঁহার হৃদয়-মনের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজনন্দনের রমণীহৃদয়জিৎ সুকুমার কান্তির মোহমন্ত্রে সেই সন্ধ্যার মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তেই কিশোরীহৃদয়ের প্রসুপ্ত প্রেমের বিল্ব-অধিবাসও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের জননী যখন জানিতে পারিলেন যে এই প্রণয়িযুগলের তরুণহৃদয় অশরীরী দেবতা অদৃশ্যে বসিয়া তাঁহার পুষ্পবন্ধনের নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তখন রতিপতির সাহায্যার্থ প্রজাপতিকে আমন্ত্রণ দিবার প্রস্তাব তিনি সম্রাট্ এবং মেহেরের জননী গীয়াস-বেগমের নিকট করিয়া পাঠান। প্রণয়কে পরিণয়-

বন্ধনের দ্বারা চিরন্তন সার্থকতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার তাঁহার এই শুভ প্রস্তাব গীয়াসবেগমের অনভিপ্রেত হইল, সুতরাং সম্রাট্ আকবর শাহও তাহাতে অনুকূল মত প্রকাশ করিবার কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। প্রেমে তন্ময় তনয়ার হৃদয়ের সুকোমল স্নেহবৃত্তির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় জননীর হইল না; তিনি বুঝিলেন না যে, রাজকুমার তাঁহার দুহিতার একরূপ "স্বয়ম্বরার বর," বিধাতার নির্দ্দিষ্ট "পরম স্নেহভাজন জীবন-সহচর" এবং "বল্লভতম দয়িত;" তিনি বুঝিলেন না যে, প্রথম দর্শনের সেই পরম মুহূর্ত্ত হইতে যে দুই জনকে বিধাতা এমন করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন, তাহারা সেই বিধাতার ইঙ্গিতে একদিন পরস্পরের বড় সন্নিকটে আসিবেই—সুতরাং আজ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া কেবল সাময়িক মনঃপীড়ায় সেই তরুণ-তরুণীকে কাতর করা ব্যতীত অন্য কোন ফলই হইবে না। কিশোরী কন্যার ব্যথাকাতর অশ্রুজলের অবমাননা করিয়া নির্ম্মমহৃদয়ে তিনি মেহেরকে অপরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" যেখানে হইল না সেখানে অনঙ্গদেবতার পুষ্পবন্ধন শিথিল হইবেই, প্রকৃতির মধ্যে এরূপ বিধি-বিধান প্রায়শঃই দেখা যায়

না ; এবং বেদ কোরাণ ও বাইবেলের মন্ত্র যেখানে মহা আড়ম্বরে উচ্চারিত হয়, প্রজাপতি দেবতা তথায় সদলবলে উপস্থিত থাকিলেও অশরীরী কিশোর দেবতাটির নিপুণহস্ত সেখানে পেলব পুষ্পের গ্রন্থি-বন্ধনে দুই হৃদয়কে এক করিবার চেষ্টায় কিছু শিথিল-প্রযত্নই দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। মন্ত্রপাঠ করিয়া পরস্পরের নিকট আত্মদানের সৌভাগ্য সেলিম-মেহেরের হইল না বলিয়া প্রেম-দেবতা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন না ; তিনি এই তরুণ-তরুণীর প্রথম দর্শনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রণয়িযুগলের পরিপূর্ণ মিলনমহোৎ-সবের শুভক্ষণ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বিংশতিবর্ষ ধরিয়া নানা দুঃখ দৈন্য বিচ্ছেদ বিরহের অশ্রুসিক্ত বিমলিন দিন-গুলির মধ্যে নিরলস হস্তে ইহাদের হৃদয়-মনের গ্রন্থিবন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন। মাতা এবং কন্যার পরস্পরবিরোধী মনোভাবের সঙ্ঘাতের ফল হইল—সুদীর্ঘ কালের জন্য কন্যার দুঃসহ মনঃপীড়া। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আত্মবলিদানের মহিমা বড় উজ্জ্বল হইয়া চক্ষুর সম্মুখে দেখা দেয়—বুঝি মেহেরেরও তাহাই হইয়াছিল। সে হয়ত মনে করিয়াছিল যে নিজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যাউক, মাতার ইচ্ছার সম্মানরক্ষা করাই কন্যার ইহজগতের একমাত্র

অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। সেদিনে হয়ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, যাহাকে তাহার নারীহৃদয়ের অগাধ প্রেমসম্পদ অকৃপণহস্তে দান করিয়াছে, আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়া দিবার অভয়-আশ্বাসে যাহার অন্তর হইতে দ্বিধা আশঙ্কা সমস্তই বিদূরিত করিয়া দিয়াছে, অবিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে সার্থক-জীবনের পরমানন্দ লাভের আশায় একান্ত উৎসুক মনে পরিণয়ের শুভদিনকে যে নিতান্ত আগ্রহভরে নিত্য আহ্বান করিতেছে, আশাভঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার কি দুর্দ্দশা হইবে! মেহের মনে করিয়াছিল, মাতার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বৈশাখী বজ্রাগ্নিতে কেবল বুঝি তাহারই একার হৃদয় পুড়িয়া ভস্ম হইবে;—বুঝে নাই যে, মোগলপ্রাসাদের মণিহর্ম্ম্য-চূড়াও সেই বজ্রাঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—বুঝে নাই যে, মাতার অপরিণামদর্শী স্বেচ্ছাচার তাহার বড় আদরের রাজরাজ জাহাঙ্গীরের প্রেমাববোধিত হৃদয়কেও তাহার বিরহব্যাকুল হৃদয়ের সহিত একই বেদনাশয্যায় শয়ন করাইয়া দিবে।

এই ভ্রমসঙ্কুল আত্মত্যাগের ফল হইল—বিংশবর্ষব্যাপী বিরহবেদনা। নানা দুঃখ দৈন্য ক্ষোভ ক্ষতি ও পরিতাপে পরিশ্রান্ত জীবনের অপরাহ্ণে জাহাঙ্গীরের ভাগ্যে যখন অল্প সময়ের জন্য মেহেরের সাহচর্য্য

সান্নিধ্য ও সঙ্গের পরমানন্দ লাভ হইয়াছিল, বিরহ-জর্জ্জরিত জীবনের সায়াহ্নে যখন মেহেরের ফল-পুষ্পসমন্বিত প্রচ্ছায়-প্রেমপাদপতলে দুই দণ্ড জুড়াইবার সৌভাগ্য জাহাঙ্গীরের ঘটিয়াছিল, সে দুই দণ্ড যে তাহাদের জীবনের কি দুর্ল্ভ দুই দণ্ড গিয়াছে, তাহা সেলিম এবং মেহেরের অন্তরাত্মাই জানিত। বিংশতি বর্ষ ধরিয়া বিপুল বিরহের ব্যথা ভোগ করিতে করিতে মেহের তাহার সকল অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল যে কেবল মাতার উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছার ভৈরবী-মন্দিরে আত্মবলিদান করিয়া একান্ত প্রেমাশ্রিত জনকে বিচ্ছেদ-বেদনার যমযন্ত্রণার মধ্যে তাহার অবসান ঘটানই নারীজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে; বুঝিয়াছিল যে, যাহার অন্তরের মধ্যে প্রেমের বিচিত্র-বর্ণানুরঞ্জিত আলোকোজ্জ্বল মধুমধ্যাহ্নের মদির আবির্ভাব তাহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, চিরবিরহের মেঘান্ধকারে সে আলোক চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত করা তাহার কর্ত্তব্য নহে; বুঝিয়াছিল যে, মর্ত্ত্যের মানবের পরিতৃপ্তির জন্য স্বর্গের দেবতাকে বিমুখ করা বিধাতার বিধান নহে; বুঝিয়াছিল যে, যথাকালে পুরোহিত তাহার অঞ্চলে যে রত্ন বাঁধিয়া দেয় নাই, দেবতার দক্ষিণ হস্ত হইতে সে পরম দান পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিয়া, সমাজে "লক্ষ্মী" নাম লাভ করাই জীবনের একমাত্র 'কৃত্য' নহে; বুঝিয়া-

ছিল যে, যে ভয়বিহ্বল হতভাগ্যকে অবিচ্ছেদ মিলনের বরাভয় দিয়া তাহার সকল ভয় বিদূরিত করিয়াছিল, মাতার ভ্রূকুটিকুটিল-কটাক্ষে তাহাকে চিরবিচ্ছেদের অনির্ব্বাণ দহনজ্বালায় চিরদিন দাহ করা তাহার নারীধর্ম্ম নহে। তাই বৈধব্যের বিধিবদ্ধ শোক-সময়ের অবসানে জাহাঙ্গীর যখন তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত পরম ধনকে প্রসারিত বাহুর নিবিড় বন্ধনের মধ্যে বিপুল আবেগে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ডাকিলেন, সে চিরজীবনের প্রাণপণ প্রেমের সাদর আহ্বানকে সেদিনে মেহের আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের "প্রাণপ্রিয়বিহঙ্গিনী" তাহার "রাজরাজের" হৃদ্‌পিঞ্জরের মধ্যে স্বেচ্ছায় আসিয়া ধরা দিল। দিনান্তের দুর্লভদর্শনের ক্ষণিক আনন্দ হইতে একদিন কোনও কারণে বঞ্চিত হইলে যাহাদের চক্ষুর উপর হইতে চন্দ্র সূর্য্য দুই-ই নিবিয়া যাইত, স্থায়ী বিচ্ছেদে তাহাদের অন্তরে যে কি বেদনা বাজে, মেহের এই সুদীর্ঘ বহুবৎসরের বিরহব্যাকুল দিনের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহা দেহ মন ইন্দ্রিয় দিয়া ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। তাই মাতার স্বেচ্ছাচারের বিধানকে বিধি-বিধানের মত নতশিরে আর সে গ্রহণ করিল না। অকারণ 'ত্যাগের' অন্যায় মহিমায় তাহার মন আর ভুলিল না; বরং নিষ্কারণে পরিত্যক্ত প্রিয়দয়িতকে তাহার বুভুক্ষিত স্নেহের মধ্যে পরমাদরে কুড়াইয়া লইয়া অজস্র স্নেহ-

ধারায় তাহার বিগত দুঃখের সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল। একদিন যাহাকে নয়নজলের মধ্যে বিদায় দিয়াছিল, মেহের সেই দুঃখাতুর দয়িতের দুই হস্ত তাহার পরিণত মনের পরমস্নেহের মহার্ঘ দানে ভরিয়া দিল। জীবন-প্রভাতের ভ্রমসঙ্কুল সেই আত্মবলিদানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে জীবন-সায়াহ্নে করিল।

যে প্রেমের মোহনস্পর্শে লৌহ সোণা হইয়াছিল, মদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, রাজ্যের সম্পদ সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে প্রেমের পূত ধারায় স্নান করিবার জন্য আজ আর কেহ নাই !

জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীরের জীবনসূর্য্য আজ অস্তমিত। তাঁহার দেহাবশেষ সর্ব্বসহা ধরিত্রীর বিদীর্ণ বক্ষের মধ্যে রক্ষা করা হইল। শাহ্‌দারার শ্মশান-মন্দিরের হৃদয়তলে মরণস্তব্ধহৃদয় রাজদেহ আজ ধীরে ধীরে সমাহিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে নারীর জাগ্রত হৃদ্‌পিণ্ডেরও আজ 'কবর' হইয়া গেল, মূর্ত্তিমতী বিরহ ব্যথার ন্যায় "বসনে পরিধূসরে বসানা ... ... ধৃতৈকবেণিঃ," বিগ্রহধারিণী করুণা সেই মেহের-উন্নিসা কেমন করিয়া জন্মমৃত্যুর সীমান্তরেখা শাহদারার সেই প্রেতভূমি হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহা দুর্নিবার বিরহবেদনায় অভিজ্ঞ ভুক্তভোগী জনের কল্পনা-নয়নে দেখিবার সামগ্রী—বর্ণনা করিবার পদার্থ নহে। দশমীর

বিসর্জ্জন দিনে মাটীর পুতুল জলে ভাসাইয়া আমরা সজল নয়নে বাড়ী ফিরি, বৎসরান্তে আবার পাইব সে সান্ত্বনাও তখন কোন কার্য্যই করে না। আর হৃদয়-বিহারী চিরারাধ্য জীবন্ত দেবতাকে ধরণীর বিদীর্ণ অন্ধ-বক্ষতলে চিরদিনের জন্য শয়ন করাইতে বক্ষে কি বেদনা বাজে, তাহা লিখিয়া কি জানানো যায় ?

আজ জগদালোকরূপিণী মেহের-উন্নিসার সব শেষ হইয়া গিয়াছে। যে পথপার্শ্বে জন্মিয়াও সম্রাজ্ঞী হইয়াছিল, সম্রাজ্ঞী হইয়া যে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্য দুই-ই শাসন করিয়াছে, যাহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে অসংখ্য যোদ্ধার উন্মুক্তকৃপাণ উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ঝলকিয়া উঠিত, যাহার কৃপাকটাক্ষপাতের আশায় ভারতের হিমমেরু হইতে কুমারিকার সমগ্র জনসংখ্যা নির্ণিমেষ নেত্রে রঙ্-মহলের গবাক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিত—আজ তাহার চাহিবার আর কিছুই নাই; আছে কেবল মৃত্যু—তাহা সে দিনরাত্রির সকলগুলি দণ্ডপলমুহূর্ত্ত ধরিয়াই চাহিয়াছিল। আর চাহিয়াছিল, মরণান্তে তাহার প্রিয়পতির পার্শ্বে সমাহিত হইবার সৌভাগ্যটুকু। হায়, সেটুকুও সে আজ পাইল না! জীবনব্যাপী প্রেমের এই শেষ আকাঙ্ক্ষার সম্মান সকলে দেখাইতে পারে না, কারণ প্রেমের প্রার্থনা হৃদয় দিয়া বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান সকলকে দেন নাই। কিন্তু যাঁহাকে দিয়াছেন, যিনি মিলনের সুখ এবং



বিরহের বেদনা দুই-ই বুঝিয়াছেন, তাঁহার নিকটেও প্রেমের প্রাণপণ প্রার্থনা যদি স্থান না পায়, তবে সে দুঃখ রাখিবার স্থান জগৎ খুঁজিয়া যে মেলে না!

সত্য, শাজাহান বাদশাহ মেহেরের সপত্নীপুত্র; স্বামীনিদেশে শাহরিয়ারকে সাম্রাজ্য দিবার চেষ্টা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান করিয়াছিলেন সে কথাও সত্য। এরূপ ক্ষেত্রে শাজাহান বিমাতা নূরজাহানের প্রতি সদয় ব্যবহার না করিলে, এই হিংসাদ্বেষ-পরিপূরিত স্বার্থপর পৃথিবীর জীব হইয়া বাদশাহকে বিশেষ দোষ দেওয়া হয়ত বা কঠিন হয় সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, সম্রাট্ শাজাহানের নিকট কোন প্রার্থনা জানান নাই; প্রেমবিহ্বলা প্রিয়হারা মেহের প্রিয়াবিরহকাতর প্রেমিকপ্রবর খুরমের নিকট মরণান্তের এই স্থানটুকু প্রার্থনা করিয়াছিল। জীবনের সযত্ন-সঞ্চিত বড় আদরের সঞ্চয়টুকু "দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়" একথা জানিয়াও, "কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল একবিন্দু নয়নের জল" রাখিয়া যাইবার জন্য বিশ সহস্র লোককে বিংশতিবর্ষ দিবারাত্রি পরিশ্রম করাইয়া, কত বিংশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া, জগৎপ্রথিত ভারত সাম্রাজ্যের রূপকথার অধিক ধনকোষ শূন্য করিয়া যিনি "তাজমহল" রচনা করিয়াছেন—যিনি তাঁহার প্রিয়াবিরহিত

হৃদয়ের "অশান্ত ক্রন্দন"কে চিরস্থায়ী করিবার জন্য চিরমৌন পাষাণের "কঠিন বন্ধনে" তাহাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন—মিলন-মহোৎসবের মধুর মুহূর্ত্তে জ্যোৎস্না-স্নাত নিভৃত মর্ম্মরমন্দিরে প্রিয়তমার কর্ণকুহরে কথিত প্রেমাদরের প্রলাপবাণীকে এই ধূলিমলিন ধরণীতলে রাখিয়া যাইবার জন্য "প্রশান্ত পাষাণের সৌন্দর্য্যময় পুষ্পপুঞ্জে" যিনি "তাজ" রচনা করিয়া গিয়াছেন, **সেই আদর্শ রাজবিরহী কুমার খুরমের নিকট আদর্শ প্রেমিকা প্রিয়সান্নিধ্য-বিচ্যুতা** মেহেরের সকরুণ প্রার্থনার সম্মান রক্ষা হয় নাই ! "প্রভাতের অরুণাভাসবাসিনী, পূর্ণিমা চামেলীর দেহহীন-লাবণ্য-বিলাসিনী" অপ্রাপ্য প্রিয়তমার নিখিল সৌন্দর্য্যের দুষ্প্রাপ্য লোক হইতে কাতর প্রার্থনা বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াও, "**ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া**"—এই "বাক্যহারা" বাক্য যে "তাজ" আজ শত শত বর্ষ ধরিয়া কোটি কণ্ঠে বিঘোষিত করিতেছে, তাহারই রচয়িতা শাজাহানের নিকট মেহেরের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল ! যে বিরহকাতর রাজকুমারের বিরচিত পাষাণময় শোকগাথা "আজ সর্ব্ব মানবের" শোকসঙ্গীত হইয়া এ বিশ্বের অনন্ত বিরহ-বেদনার করুণ গানে আকাশ বাতাস জল স্থল ভরিয়া রাখিয়াছে, সেই বিরহীর নিকট বিরহিণীর বেদনার

ভিক্ষা বিফল হইল, এই হৃদয়ভেদী দুঃখ বুঝিবার শক্তি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন, কেবল তিনিই ইহা বুঝিবেন।

মোগলের আদিপুরুষ তৈমুরের শস্ত্রশক্তির ভীষণ পরিচয় জগৎ একদিন পাইয়াছিল, তাহার কৃত নরমুণ্ডের মন্দিরচূড়াগ্রভাগ একদিন ভারতবর্ষের শান্ত সুনীল আকাশতলে হাহাকারধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের ইরাণী নাদির এবং আফগান আবদালীর কীর্ত্তি-কুশলতায় দিল্লীজনপদের পাষাণপথ শোণিতের কর্দ্দমে একদিন পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অভ্রভেদী মর্ম্মরমন্দির যাহার সুবর্ণচূড়াগ্রভাগের রশ্মিরেখায় ভারতের নীলাকাশ একদিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে অত্যুজ্জ্বল মণিহর্ম্ম্যের 'নন্দা' 'ভদ্রা' 'জয়া' প্রভৃতি শিলার বিন্যাস নির্ম্মমতার বজ্রলেপে সুদৃঢ় হয় নাই—তাহা আক্‌বর শাজাহান প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষগণের দয়াধর্ম্ম-স্নেহমমতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রিয়তমজনের একান্ত বিরহের দুঃসহ সন্তাপে সন্ত্রস্তা বিরহিণী মেহের-উন্নিসা যেদিনে যুক্তকরে পতিপার্শ্বে সমাহিত হইবার স্থানটুকু প্রার্থনা করিয়াছিল, সেদিনে সে সেই লোকোত্তর সম্রাট্ শাজাহানের নিকটেই প্রার্থনা করিয়াছিল; এবং সেদিনে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, বিরহের পুটপাকে যে রাজপ্রণয়ীর হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট বিরহিণীর অন্তিম যাচ্ঞা

এমন করিয়া ব্যর্থ হইবে; ভাবে নাই যে, যিনি স্বয়ং লোকান্তরিতা প্রিয়তমার ইহ পৃথিবীর শেষশয়নের এক-প্রান্তে নিজের প্রাণহীণ দেহকে শায়িত করিবার বাসনা অন্তরে পোষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট বিচ্ছেদবেদনা-তুরা অনাথার সেই অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

কিন্তু হায়, তাহা হইয়াছিল! একান্ত স্নেহের ধনকে অকালে অকস্মাৎ মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া যে রাজবিরহী বিরহের জ্বালাময় হোমকুণ্ডে সমগ্র জীবন ভরিয়া নিজ পঞ্জরাস্থিগুলিকে সমিধ্‌রূপে আহুতি দিয়াছেন, জীবনাবসান-সময়ে কারাগৃহের বাতায়নপথে মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন নেত্রে যে নরপতি প্রিয়তমার শেষনিবাসের দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া ইহলোকের শেষ শ্বাস ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই মোগল-গৌরব রাজরাজেশ্বর প্রিয়গতপ্রাণ প্রেমিক শাজাহানের নিকট বেদনাতুর নারীহৃদয়ের শেষ প্রার্থনা পূরণ হয় নাই,—এ দুঃখ শুধু মেহের-উন্নিসার নহে, জগতের সমস্ত প্রিয়হারা জনের বক্ষপঞ্জরে চিরদিন ইহা বিষ-শল্যের মত বিদ্ধ হইয়াই থাকিবে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সমাধিভবন শাহদারায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর শাহের পার্শ্বে মেহের-উন্নিসার শবদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল না, কিয়দ্দূরে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র সমাধিমন্দিরে এক দীনহীন শবাধারে জগতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ রাজাধিরাজ জাহাঙ্গীরের অনুপম রূপলাবণ্যবতী প্রাণপ্রিয়া দয়িতা ভারতেশ্বরী মেহের-উন্নিসার প্রাণহীন দেহ সমাধিস্থ করা হয়। রাজোচিত সম্মানসহকারে হয়ত এই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সেদিনে নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল না, প্রেতের তৃপ্তির জন্য ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুবর্ত্তিগণের চিরাচরিত প্রথানুসারে শবাধারের প্রস্তরাচ্ছাদনের উপরে নিত্য পুষ্পোপহার প্রদান এবং শ্মশানমন্দিরে মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে ধূপারতি প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানগুলিও কালক্রমে অনাচরিতই রহিয়াছে।

নন্দনোদ্যানের মন্দারপুষ্পের ন্যায় অপ্রাপ্য পদার্থও হয়ত সুখসৌভাগ্যের দিনে যাঁহার দুষ্প্রাপ্য ছিল না, আজ তাঁহার শ্মশানশয্যার সন্নিধানে বনজ পুষ্পের অঞ্জলিও দিনান্তে কেহ বহন করিয়া আনে না। ইরাণী গোলাপের বক্ষরসে যাঁহার মণি-মুক্তা-খচিত মহার্ঘ পরিচ্ছদ নিত্য সুবাসিত হইত, তাঁহার অতিদীন সমাধিশয়নের নিকট মৃণ্ময় ধূপাধার রাখিবার জন্য একখানি হস্তও আজ আর প্রসারিত হয় না, এ দুঃখ বড় দুঃখ!

কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে। যে দীনাতিদীন সমাধি-মন্দিরে জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের একাধিশ্বর ভারতপতি জাহাঙ্গীরের

চিরাকাঙ্ক্ষিতা চিরপ্রিয়তমা দয়িতার শবদেহ শেষ-শয়নে শায়িত করা হইয়াছিল, সংস্কারাভাবে কালক্রমে সেই জীর্ণ মন্দির ধীরে ধীরে ধূলিতলে তাহার শয়ন বিছাইতে লাগিল; তাহার সংস্কারকল্পে চেষ্টা ত দূরের কথা, সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার লোকও বিস্তীর্ণ ভারতভূমি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। একদিন এমন সময় আসিয়াছিল, যখন কেহ জানিত না যে, কোন্ নরপতির হৃদয়েশ্বরী, কোন্ লোকললামভূতা সুন্দরীপ্রধানা পৃথিবীর বক্ষ হইতে তাঁহার রক্তকোকনদ-রাতুল চরণযুগল সংহরণ করিয়া লইয়া এই মৃত্যু-মন্দিরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন।

মেহের-উন্নিসার শবদেহের আবরণ-প্রস্তরের উপর দিয়া লাহোরের উপকণ্ঠধাবিত লৌহবর্ত্ম যাইবারও সম্ভাবনা একদিন হইয়াছিল! রেল কোম্পানির নিযুক্ত মুন্সী প্রস্তরফলকের ক্ষোদিত লিপিপাঠে যখন জানিতে পারে যে মোগল-রাজচক্রবর্ত্তী জাহাঙ্গীরের হৃদয়নন্দনের উর্ব্বশী, প্রিয়রাণী মেহেরের দেহাবশেষ ঐ শবাধারে রক্ষিত আছে, তখন তাহারই চেষ্টায় ও আবেদনে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ঐ শবাধার সযত্নে স্থানান্তরে রক্ষা করিয়া সমাধি-মন্দিরের সংস্কার-সম্পাদন কল্পে আজ্ঞা প্রচার করেন; এবং মন্দিরের জীর্ণসংস্কার শেষ হইলে ভারতভাগ্যবিধাতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রিয়তমা ভার্য্যার পার্থিব দেহাবশেষ পুনরায় ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরের সমাধিগহ্বরে রক্ষা করা হয়।

আগ্রা নগরীর পাদমূল-প্রবাহিতা যমুনার পরপারে "ইৎমাদ উদ্দৌলার" যে বিচিত্র কারুখচিত কবরচূড়া পথিকের নয়ন-গোচর হয়, উহা মেহেরের পিতা গীয়াসবেগের সমাধিভবন। মোগলের স্থাপত্যসম্পদের মধ্যে আজ যে সকল মন্দির মস্‌জিদ

মিনার কবর দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য লোক বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে শাজাহান-মহিষী মমতাজের সমাধিমন্দির "তাজ" ব্যতীত, গীয়াসের কবর 'ইৎমাদে'র তুল্য ইমারত ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। যাঁহার আজ্ঞায় নানাদেশ হইতে বিচিত্র শিল্পসামগ্রী আহরিত হইয়া বহুব্যয়ে নির্ম্মিত ইৎমাদ-উদ্দোলা গীয়াসের সমাধিভবন আজও সমগ্র দেশের শিল্পসৌন্দর্য্যের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে, ভারতের সেই অতুলনীয়া সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধিভবনে দীপ জ্বালিবার ও পুষ্পাঞ্জলি দিবার লোক ভারত খুঁজিয়া মেলে নাই; এবং জীবনে যাঁহার কোমল হৃদয়ের স্নেহবৃত্তির উপর দিয়া মাতা প্রভৃতি নিতান্ত আপন জনের নির্ম্মমতার বজ্রপেষণ চলিয়াছে, মৃত্যুর পরেও তাঁহার সুকুমার দেহাবশেষের উপর লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণের সম্ভাবনা হইয়াছিল এ কথা ভাবিলে, অশ্রু-অন্ধ নয়ন ঊর্দ্ধে তুলিয়া বারবার অদৃষ্টদেবতাকেই নমস্কার করা ব্যতীত, কোন দিক হইতে কোন সান্ত্বনাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।